কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে গাইডলাইন ২০২০

জাতীয় পুষ্টিসেবা, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

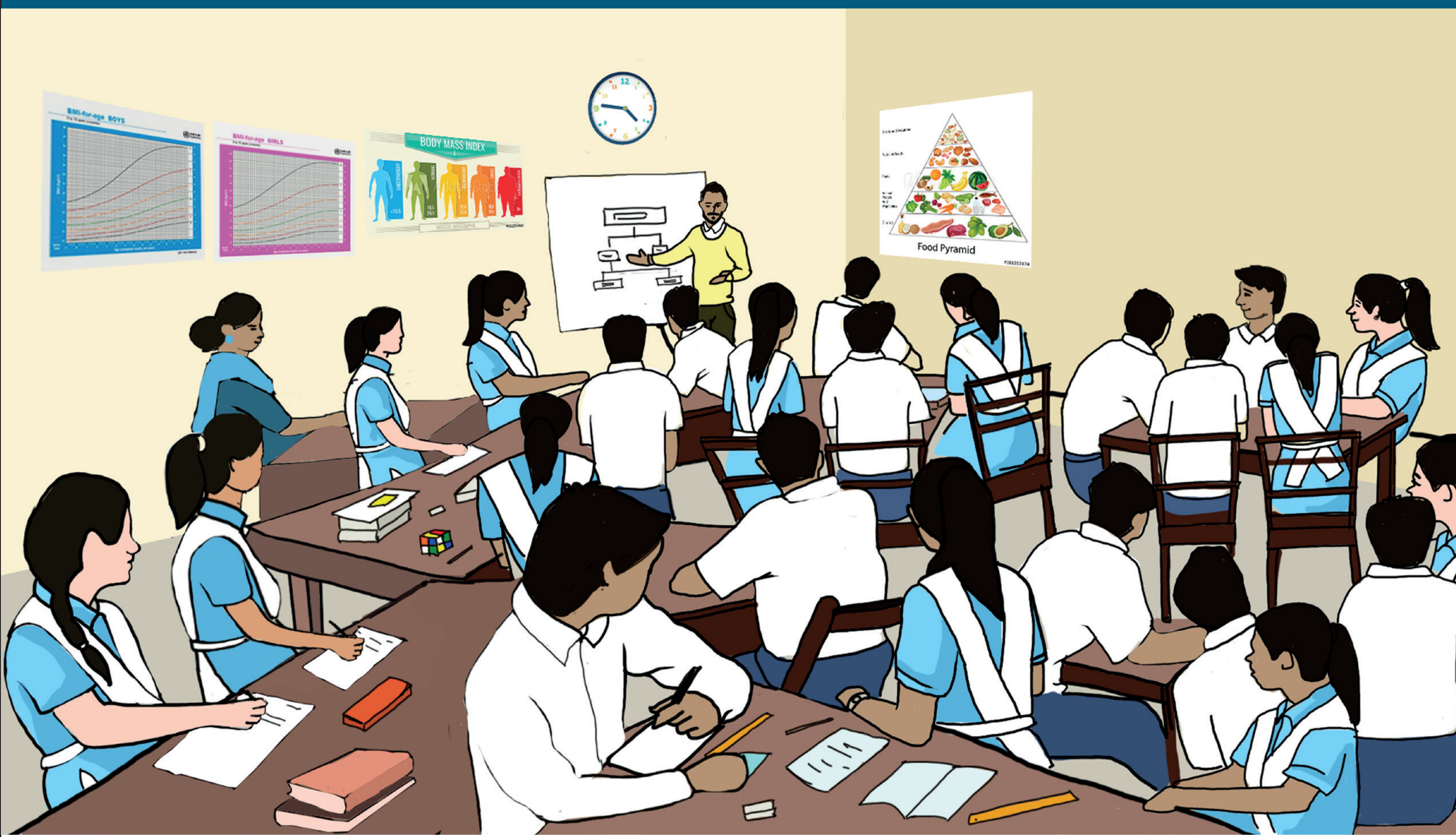

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে গাইডলাইন ২০২০

প্রকাশনার তারিখ: অক্টোবর ২০২০

প্রকাশক:
জাতীয় পুষ্টিসেবা
জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান
মহাখালী, ঢাকা
বাংলাদেশ

জাতীয় পুষ্টিসেবা, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর যৌথ উদ্যোগে এবং ইউনিসেফের কারিগরী ও আর্থিক সহায়তায় "এই কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে গাইডলাইন ২০২০" টি তৈরী করা হয়ছে। এই প্রকাশনাটি কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম-এর সাথে সম্পৃক্ত সকল প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সেবাপ্রদানকারী, সরকারী, বেসরকারী, জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক সংস্থা ব্যবহার করতে পারবে। তবে প্রয়োজন হলে জাতীয় পুষ্টিসেবা, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান-এর অনুমোদন সাপেক্ষে পুণরায় মূদ্রণ করা যেতে পারে। পুণরায় মূদ্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সফট্ কপি ইউনিসেফের কাছে সংরক্ষিত থাকবে। এই প্রকাশনাটি জাতীয় পুষ্টিসেবা/জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং ইউনিসেফের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

প্রচ্ছদ ডিজাইন
উপমা হায়দার

ডিজাইন ও লেআউট
আজাদ/কলি/দৃক

কৈশোরকালীন পুষ্টি

কার্যক্রম বাস্তবায়নে

গাইডলাইন ২০২০

সূচীপত্র

বাণী ৩

ভূমিকা ১৩

প্রথম অধ্যায়ঃ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১৪

১.১ লক্ষ্য ১৫

১.২ উদ্দেশ্য ১৫

১.৩ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ ১৬

২.১ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় (জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়) ১৭

২.১.১ জাতীয় পর্যায়ে সমন্বয় সাধন ১৭

২.১.২ আঞ্চলিক/জেলা পর্যায়ে সমন্বয় সাধন ১৭

২.২ স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির অংশগ্রহণ ১৮

২.৩ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কিশোর-কিশোরী ক্লাব কার্যক্রম পরিচালনা ১৮

২.৩.১ কিশোর-কিশোরী ক্লাবের গঠন ১৮

২.৩.২ কিশোর-কিশোরী ক্লাবের কার্যাবলি ১৯

২.৩.৩ কিশোর-কিশোরী ক্লাবের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ২০

২.৪ মাধ্যমিক বিদ্যালয়/মাদ্রাসা-ভিত্তিক ক্লাবের উপদেষ্টা কমিটি গঠন ২০

২.৫ ব্যবস্থাপক/সেবা প্রদানকারীদের ভূমিকা, দায়িত্ব, এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ২১

২.৫.১ ব্যবস্থাপক/সেবা প্রদানকারীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব ২১

২.৫.২ ব্যবস্থাপক/সেবা প্রদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ২৫

২.৬. বিদ্যালয়ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ এবং প্রেরণ ২৬

তৃতীয় অধ্যায়ঃ কিশোর-কিশোরীদের জন্য পুষ্টি কার্যক্রম ২৮

৩.১ স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস উন্নয়নে পুষ্টি শিক্ষা ২৯

৩.২ ওজন, উচ্চতা এবং বি.এম.আই মনিটরিং ৩০

৩.৩ সাপ্তাহিক আয়রন ফলিক এসিড (WIFA) ট্যাবলেট সরবরাহ ৩২

৩.৪ কৃমি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ৩৫

৩.৫ বিদ্যালয় ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে রেফারাল পদ্ধতি স্থাপন ৩৫

৩.৬ শরীরচর্চা কার্যক্রম প্রচার ৩৭

চতুর্থ অধ্যায়ঃ বিদ্যালয়-ভিত্তিক কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সাথে কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাবের যোগাযোগ স্থাপন ৩৮

বাণী

মাননীয় মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন "সোনার বাংলাদেশ গড়বে সোনার মানুষেরা"। বঙ্গবন্ধুর এই স্বপ্নের সোনার মানুষ গড়তে হলে সবার আগে যেটি প্রয়োজন তা হলো আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অর্থাৎ কিশোর-কিশোরীদের সঠিক জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিয়ে সুস্থভাবে বেড়ে ওঠা। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩৬ মিলিয়ন হচ্ছে কিশোর-কিশোরী যাদের বয়স ১০-১৯ বছর, অর্থাৎ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২০ ভাগ।

বর্তমান সরকার কিশোর-কিশোরীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছে, যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের কাছে বাংলাদেশকে অনুসরণীয় করে তুলেছে। সরকার বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

পুষ্টি জনস্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। কর্মক্ষম ও শক্তিশালী জাতি গঠনে পুষ্টি অপরিসীম ভূমিকা পালন করে। দেশের পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নয়নে সরকার দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। একটি দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে সেই দেশের মোট জনসংখ্যার বৃহৎ একটি অংশের শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান ও অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম হয়ে গড়ে ওঠার উপর। আর সেটা সম্ভব শুধুমাত্র কিশোর-কিশোরীদের সঠিক পুষ্টি চাহিদা পূরণের মাধ্যমে, যাতে তারা পরিপূর্ণভাবে দৈহিক ও মানসিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে।

আমি মনে করি, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে মাধ্যমিক পর্যায়ের কিশোর-কিশোরীদের সার্বিক পুষ্টি ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে যে ৬টি পুষ্টি কার্যক্রম শুরু হয়েছে তা নিঃসন্দেহে কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি চাহিদা পূরণের মাধ্যমে তাদের পড়ালেখায় সাফল্য ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করবে। সর্বোপরি, তাদেরকে কর্মক্ষম করে ভবিষ্যৎ সোনার বাংলাদেশ গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি গাইডলাইন তৈরী করা হয়েছে। এই " কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে গাইডলাইন ২০২০"-এ উল্লিখিত প্রকল্পের সাথে যুক্ত সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা হয়েছে, একই সাথে কার্যক্রমটি কীভাবে পরিচালিত হবে তার কৌশলসমূহ সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, এই কার্যক্রমটি বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীদের উন্নয়নে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জাহিদ মালেক, এমপি

বাণী

মাননীয় মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

'শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ'- এ প্রত্যয়কে সামনে নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। আমরা চাই দেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে। যুগোপযোগী শিক্ষা পাঠক্রম প্রনয়ণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, গবেষণা, লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সহশিক্ষাপাঠক্রম কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের কাঙ্খিত মান অর্জনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশেরও বেশি কিশোর-কিশোরী যাদের বয়স ১০-১৯ বছরের মধ্যে। এই কিশোর-কিশোরীদেরকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার।

পুষ্টি এবং শিক্ষা একে অপরের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত যা শিক্ষা মন্ত্রণালয় খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পুষ্টিহীনতায় ভুগছে এমন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ভাল ফলাফল আশা করা যায় না, কারণ অপুষ্টি শিক্ষার্থীদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই স্বাস্থ্যবান, মেধাবী ও সৃজনশীল ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরি করতে কৈশোরকালীন পুষ্টিতে বিনিয়োগ করতে হবে। অপুষ্টির দুষ্ট চক্র ভাঙতে আমাদেরকে কৈশোরে সঠিক পুষ্টি নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে কৈশোরকালীন পুষ্টি সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে শিক্ষা মন্ত্রাণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি উন্নয়নে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমি আরও আনন্দিত যে কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে যা রেফারেন্স টুল হিসেবে সারা বাংলাদেশের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাসমূহে ব্যবহৃত হবে। আমার বিশ্বাস, এই গাইডলাইনটি শুধুমাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা নয়, এর পাশাপাশি কমিউনিটির কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি উন্নয়নেও সাহায্য করবে। আমি দেশব্যাপী কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডা. দীপু মনি, এমপি

বাণী

মাননীয় উপমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রয়োজন মেধাবী, সৃজনশীল আগামী প্রজন্ম। বর্তমান সরকারের সময়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, ভর্তির হার বেড়েছে, ঝরে পড়া কমেছে, শিক্ষা চক্র সমাপন এবং জেন্ডার সমতায় অগ্রগতি হয়েছে। অপুষ্টি ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তাশক্তি, আচরণ ও স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের পড়ালেখায় মনোযোগ কমিয়ে দেয়। তাই এর জন্য প্রথমেই নিশ্চিত করা প্রয়োজন কৈশোর বয়সের সঠিক পুষ্টি। ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের সঠিক পুষ্টি নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

পুষ্টিতে বিনিয়োগই হচ্ছে সেরা বিনিয়োগ। সে জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষার্থীদের পুষ্টিহীনতা দূর করে সুশিক্ষিত কর্মক্ষম জাতি গঠনে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কারিগরি শিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন জাতীয় পুষ্টিসেবা/জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, ইউনিসেফের সহযোগিতায় স্কুল, মাদ্রাসা ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

আমি জেনে আনন্দিত যে, দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল বিদ্যালয়ে পুষ্টি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য "কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে গাইডলাইন ২০২০" তৈরি করা হয়েছে এবং পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে করে ছাত্র-ছাত্রীদের পুষ্টির সার্বিক চিত্র পরিবর্তন হবে বলে আশা করি।

আমি কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং উক্ত কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

মহিবুল হাসান চৌধুরী, এমপি

বাণী

মাননীয় সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ গত দুই দশকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেক্টরে লক্ষণীয় উন্নতি সাধন করেছে। বাংলাদেশের বিস্তৃত ও ক্রমবর্ধিত জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে কিশোর-কিশোরীরা। বাংলাদেশের বর্তমান কিশোর-কিশোরীদের সংখ্যা আনুমানিক ৩৬ মিলিয়ন, যা অন্যান্য অনেক দেশের জনসংখ্যার তুলনায় বেশি। কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন জনস্বাস্থ্যের সার্বিক উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই সব কিশোর-কিশোরীদের পরিপূর্ণ পুষ্টি ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং দেশের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার সাথে মিল রেখে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কিশোর-কিশোরীরা শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। কিশোরীরা বাল্যবিবাহ, অপরিকল্পিত গর্ভধারণ, নির্যাতন এবং অপুষ্টির শিকার হয় যা তাদের জীবনকে মারাত্মক হুমকির মুখে ঠেলে দেয় বা মৃত্যু ঘটায়। কিশোরী অবস্থায় গর্ভধারণ মাতৃত্বকালীন ও শিশু মৃত্যুর হার বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া আরও অনেকে আছে যারা রোগাক্রান্ত অবস্থায় বেঁচে থাকে যা তাদেরকে বংশপরম্পরায় দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের মধ্যে আবদ্ধ রাখে। যদি আমরা বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীদেরকে স্বাস্থ্যকর এবং কর্মক্ষম করার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে বিশ্বে উন্নত একটি জাতি হিসেবে তুলে ধরতে চাই, তাহলে অবশ্যই এই বিষয়গুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

আমি মনে করি, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কমিউনিটি ক্লাব পর্যায়ে কিশোর-কিশোরীদের সার্বিক পুষ্টি ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য যেসকল পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এই বাস্তবায়ন গাইডলাইনে উল্লেখিত প্রকল্পের সাথে যুক্ত সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা হয়েছে, একই সাথে কার্যক্রমটি কিভাবে পরিচালিত হবে তার কৌশলসমূহ সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, এই কার্যক্রমটি বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি ও শিক্ষা উন্নয়নে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

মোঃ আবদুল মান্নান

বাণী

মাননীয় সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আজকের কিশোর-কিশোরীরা আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আমাদের মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ হলো কিশোর-কিশোরী। কিশোর-কিশোরীরাই আগামীতে দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, যদি তারা যথাযথ স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শিক্ষা নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে।

বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তুলনামূলকভাবে ভর্তির হার বাড়ানো, ঝরে পড়া কমানো, শিক্ষাচক্র সমাপন এবং জেন্ডার সমতায় ব্যাপক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। তবে আরো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এর ২০১৮ সালের তথ্য অনুযায়ী, মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের ভর্তির হার শতকরা ৫৯ ভাগ আর ছেলেদের ৪৮ ভাগ। এ ব্যবধান দূর করতে হবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিদ্যমান পুষ্টির ঘাটতির প্রভাব বিবেচনা করে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিস্থিতি উন্নত করার চেষ্টা চলমান রয়েছে। এটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় পুষ্টি প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে এই যৌথ বাস্তবায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

আমার বিশ্বাস, কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে গাইডলাইনটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে, পুষ্টিসেবার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় সফলতা অর্জনের পথ প্রসারিত হবে, ঝরে পড়া রোধ হবে এবং শিক্ষা চক্র সমাপন বৃদ্ধি পাবে। ইউনিসেফসহ কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মো: মাহবুব হোসেন

বাণী

প্রতিনিধি
ইউনিসেফ বাংলাদেশ

১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীরা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশেরও বেশি, যা সংখ্যায় প্রায় ৩ কোটি ৪০ লাখ।

কাজেই কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে বিনিয়োগ একই সাথে তিনভাবে আমাদের উপকার করে থাকে। প্রথমত, কিশোর-কিশোরীদের বর্তমান সুস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে উৎপাদনশীলতা এবং তৃতীয়ত, তাদের সন্তানদের স্বাস্থ্যঝুঁকি হ্রাস করার ব্যাপারে।

কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির বিষয়টি শুধু তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে এবং শিশু অধিকারকে সমুন্নত রাখার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, দেশের ভবিষ্যৎ মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য তা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দেশে গত তিন দশকে ৬ থেকে ৭ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এবং দারিদ্র্যের হার ২০০৫ সালের ৪০ শতাংশ থেকে কমে ২০১৬ সালে ২৪.৩ শতাংশে (বিবিএস, ২০১৭ এবং বিবিএস, ২০১১) এসে দাঁড়িয়েছে; তা সত্ত্বেও প্রতি চারজন কিশোরীর মধ্যে একজন খর্বাকৃতির রয়ে গেছে (এফএসএনএসপি, ২০১৪)। অপুষ্টিজনিত কারণে উৎপাদন কম হওয়ায় এবং চিকিৎসাবাবদ খরচ মিলিয়ে বছরে বাংলাদেশের আনুমানিক ৩০০ কোটি ডলারের আর্থিক ক্ষতি হয় (গিলস্পি ও হাদাদাদ, ২০০১)।

একথা উলেখ করা প্রয়োজন যে, কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে পর্যাপ্ত মাত্রায় পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য একাধিক খাতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার কোন বিকল্প নেই।

কৈশোর হলো একইসঙ্গে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা, তা বজায় রাখা এবং শারীরিক কার্যক্রম ও অনুশীলন স্বাস্থ্যকর মাত্রায় রাখার সময়। কৈশোর ব্যক্তিগত অভিরুচি তৈরি ও স্বেচ্ছাচারিতা কিভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়তো শেখার সময়। এই সময়ে পরবর্তী জীবনে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে এমন আচরণ ও জীবনধারা সম্পর্কে তারা জানতে পারে এবং সেগুলো থেকে তারা কিভাবে দূরে থাকতে পারে তাও শিখে থাকে।

বেশিরভাগ কিশোর-কিশোরীর কাছে পৌঁছানোর জন্য সবচেয়ে কার্যকর প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যা কিশোর-কিশোরীদের জন্য শিক্ষা, পুষ্টি পরিষেবা ও সুরক্ষা পাওয়ার জায়গায় পরিণত হতে পারে। বিদ্যালয় ছাড়া কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমেও আমরা বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা কিশোর-কিশোরীদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে পারি। যদিও সব কিশোর-কিশোরীকে বিদ্যালয়ে দেখাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি কার্যক্রম ২০২০ বাস্তবায়নের জন্য এই অপারেশনাল গাইডলাইনটি চূড়ান্ত হতে দেখে আমি আনন্দিত। এটি বাংলাদেশ জুড়ে সব কিশোর-কিশোরী প্রয়োজনীয় পুষ্টি পরিষেবা পাচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন খাতের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য অতি প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি পরিষেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউনিসেফ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মিলে একযোগে কাজ করবে, যা একটি উৎপাদনশীল ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরির পথ নির্মাণ করবে।

তোমু হোজুমি

বাণী

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বর্তমান সরকার কিশোর-কিশোরীদের সার্বিক পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের অবস্থা উন্নয়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সরকার বাংলাদেশকে ২০৪১ সনের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বর্তমান বাংলাদেশ সরকার সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং মানবিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নিয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে।

সুস্বাস্থ্য জাতির উন্নয়নের পূর্বশর্ত। কিশোর-কিশোরীদের জীবনচক্রের পুরোটাই উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতে পরিণত হতে পারে যদি কৈশোর থেকে আমরা তাদের স্বাস্থ্যসেবার কার্যক্রমটি শুরু করতে পারি।

বাংলাদেশ জনতাত্ত্বিক ও স্বাস্থ্য জরিপ (BDHS)-২০১৪ কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টির সূচকের পুনঃপর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ১৫-১৯ বছরের কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যগত অবস্থা সন্তোষজনক নয়। বিশেষ করে কিশোরীদের মাঝে খর্বাকৃতির হার গ্রাম ও শহরাঞ্চলে যথাক্রমে ৩৯.৯% এবং ৩৪.৫% এবং রক্তস্বল্পতার হার যথাক্রমে ৪০% এবং ৩৬%। কিশোর-কিশোরীদের মাঝে অপুষ্টির তীব্রতা বিবেচনা করে কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যের জন্য সরকার জাতীয় কৌশল ২০১৭-২০৩০ এবং পুষ্টির জন্য দ্বিতীয় জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা (NPAN2) গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে উৎপাদনশীল কর্মী বাড়বে এবং অসংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব কমবে। কিশোরীদের জন্য এই ধরনের কার্যক্রম তাদের কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করবে এবং বিদ্যমান অপুষ্টির দুষ্টু চক্রকে প্রতিরোধ করতে সহায়তা করবে।

কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রমের সাথে জড়িত সমস্ত স্টাফ এবং অংশীদারদের কাছে এই ''কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে গাইডলাইন ২০২০'' একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকার ভূমিকা পালন করবে এবং কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত সাধারণ চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে এবং নতুন সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করতে সাহায্য করবে। কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রমটিতে কারিগরী সহযোগিতা প্রদানের জন্য ইউনিসেফ বাংলাদেশ এবং অন্যান্য সহযোগী সংস্থাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

অধ্যাপক ডাঃ আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম

বাণী

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আজকের কিশোর-কিশোরীরা আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের অন্যান্য দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন প্রজেক্ট তৈরি এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান, উপস্থাপন কৌশল এবং সৃজনশীলতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মেধাবী ও সৃজনশীল জাতি গঠনে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন যথাযথ পুষ্টি যা সকল কাজে মনোযোগী করে তুলবে। পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিকভাবে বেড়ে উঠার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের শরীরচর্চাও অত্যন্ত জরুরি।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কৈশোরকালীন পুষ্টিসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর জাতীয় পুষ্টিসেবা প্রতিষ্ঠানের সাথে ইউনিসেফ এর সহায়তায় যৌথভাবে দেশব্যাপী পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

কৈশোরকালীন পুষ্টি উন্নয়নে সার্বিক সহায়তা ও অঙ্গীকার অব্যাহত রাখার জন্য জাতীয় পুষ্টিসেবা/ জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এছাড়া কৈশোরকালীন পুষ্টি উন্নয়ন, বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়া রোধ করা ও শিক্ষার মান উন্নয়নে ক্রমাগত সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি ইউনিসেফ বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন গাইডলাইন-২০২০ তৈরিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে সাফল্য কামনা করছি।

প্রফেসর ড. সৈয়দ মোঃ গোলাম ফারুক

বাণী

লাইন ডাইরেক্টর, জাতীয় পুষ্টিসেবা
জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনস্ত জাতীয় পুষ্টিসেবা, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর যৌথ উদ্যোগে সময়োপযোগী 'কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন গাইডলাইন ২০২০' তৈরী করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি উন্নয়ন সংক্রান্ত এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের পেছনে অবদান রেখেছে। ইতিমধ্যে জাতীয় পুষ্টিসেবা, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর দেশের ৮টি বিভাগের ৪০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাইলটিং-এর মাধ্যমে কৈশোরকালীন পুষ্টি শিক্ষা বাস্তবায়ন করছে। উক্ত কার্যক্রমটির ফলাফল সারা দেশের কিশোর-কিশোরী, শিক্ষক, সরকারি সেবা প্রদানকারী সংস্থাসহ বিভিন্ন মহলের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। জাতীয় পুষ্টিসেবা, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এই গাইডলাইন তৈরির ক্ষেত্রে ইতিবাচক সহযোগিতার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই গাইডলাইন তৈরির কর্মশালাগুলোতে বিভিন্ন জেলার সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, শিক্ষক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করে গুরত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের মাধ্যমে এটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের গুরত্বপূর্ণ মতামত একইসাথে ব্যবস্থাপক ও সেবা প্রদানকারীদের কাছে নীতিমালাটির সম্ভাব্য বাস্তবায়নকে সহজ করে তুলেছেন। জাতীয় পুষ্টিসেবা, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান এর পক্ষ থেকে আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। জাতীয় পুষ্টিসেবা, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের সর্বোত্তম উপায় নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরীদের অবদানকেও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছে।

এই গাইডলাইন তৈরিতে যেসকল বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে আগত কর্মকর্তাগণ এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীবৃন্দ বিভিন্ন দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে (FGD) এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের (IPC) মাধ্যমে মূল্যবান মতামত প্রদান করেছেন, আমি তাদের প্রতিও প্রকাশ করছি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আমি আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইউনিসেফের (UNICEF) কর্মীবৃন্দকে যারা প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তার মাধ্যমে গাইডলাইনটি মাঠকর্মীদের জন্য ব্যবহার-বান্ধব করে তুলেছেন।

আমি আশাবাদী যে, উক্ত জাতীয় "কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে গাইডলাইন ২০২০" বিভিন্ন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় এবং সহযোগিতার মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। কিশোর-কিশোরীদের সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর জীবন কামনা করছি।

ডা: এস এম মোস্তাফিজুর রহমান

বাণী

পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা সুন্দর আগামীর ভবিষ্যৎ, যারা দেশ ও জাতি গঠনের প্রধান হাতিয়ার। আমরা চাই প্রতিটি শিশুর জীবন হোক সুন্দর ও সু-শৃঙ্খল। কারণ দেশ ও জাতি গঠনে কিশোর-কিশোরীরাই হবে আমাদের আগামীর যোদ্ধা, তাই তাদের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক গঠন যেন সুষ্ঠভাবে গড়ে উঠতে পারে সে লক্ষ্যে আমাদের সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দাতাগোষ্ঠী শিশুদের উন্নয়নে একত্রে কাজ করে যাচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বর্তমানে দেশের সকল কিশোর–কিশোরীর সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর জীবন গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্কুল পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমান সরকার কিশোর-কিশোরীদের মানসিক বিকাশ ও দৈহিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্কুলফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে হলে কিশোর-কিশোরীদের পড়ালেখার পাশাপাশি পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করার অভ্যাস তৈরি করতে হবে।

আমাদের সকলের মিলিত প্রয়াস কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তৈরি অপারেশনাল গাইডলাইন যা আমাদের সুন্দর আগামী ও সুশৃঙ্খল জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এই কার্যক্রম এর মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠা মেধাবী ও সৃজনশীল কিশোর-কিশোরীরা আগামীদিনে দেশ ও জাতি গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারবে। গাইডলাইনটি তৈরিতে ইউনিসেফ সহ যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করেছেন তাঁদের সকলকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

প্রফেসর ড. প্রবীর কুমার ভট্টাচার্য্য

ভূমিকা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশের বেশি কিশোর-কিশোরী, যাদের বয়স ১০ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে এবং যাদের সর্বমোট সংখ্যা প্রায় ৩৪ মিলিয়ন (বিবিএস-২০২০ প্রজেকশন, অপ্রকাশিত)। সাম্প্রতিক পুষ্টি গবেষণা থেকে জানা যায় যে, শহর এবং গ্রামের ১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোরীরা পুষ্টির ক্ষেত্রে আশংকাজনক অবস্থায় রয়েছে (DHS, 2014)। শহর এবং গ্রামের ১৫-১৯ বছর বয়সী মেয়েদের খর্বকায় (HAZ<-2SD) হওয়ার মাত্রা যথাক্রমে ৩৪.৫% এবং ৩৯.৯%। রক্তশূন্যতার হার গ্রামাঞ্চলে ৪০%-এর কাছাকাছি এবং শহরাঞ্চলে প্রায় ৩৬%।

কিশোর-কিশোরীদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যের উপর পুষ্টির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। কৈশোরকালীন বয়সে টেকসই ও পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস পুষ্টিহীনতা এবং জীবনের প্রথম দশকের খর্বকায়তা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম। স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস কিশোর-কিশোরীদের পরিণত বয়সে অসংক্রামক রোগ থেকে দূরে রাখতে পারে। কৈশোরকালীন পুষ্টিতে বিনিয়োগ তিন ধরণের সুফল বয়ে আনেঃ ১) কিশোর-কিশোরীদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে, ২) তাদের জন্য একটি সুস্থ এবং কর্মক্ষম ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করে এবং ৩) তাদের সন্তানদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস করে। মনে রাখা জরুরি যে, কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন খাতের মধ্যে সমন্বিত কার্যক্রম প্রয়োজন। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অপুষ্টির তীব্রতা মাথায় রেখে জাতীয় কিশোর-কিশোরী স্বাস্থ্য কৌশল ২০১৭-২০৩০ এবং দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় (NPAN2) কিছু প্রমাণ-ভিত্তিক কার্যক্রমের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন-: ১) পুষ্টি শিক্ষাকে মূলধারায় নিয়ে আসা ২) খাদ্যে বৈচিত্রের প্রসার ঘটানো ৩) সম্পূরক অণুপুষ্টির প্রয়োগ ৪) কৃমি নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি ৫) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ৬) কমিউনিটিভিত্তিক পুষ্টি সচেতনতা ৭) শারীরিক ব্যায়াম এবং ৮) খাদ্যসম্পূরক ও পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ প্রদান।

এই কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রমটির উদ্দেশ্য হলো ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি অবস্থার উন্নতিসাধন। প্রধান শিক্ষক, গাইড শিক্ষক, কিশোর-কিশোরী ক্লাবের দলনেতা, ক্লাব পরিচালনাকারী, কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাবের দলনেতারা এবং কিশোর-কিশোরী-বান্ধব স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সেবাপ্রদানকারীরা এটি ব্যাবহার করবেন। বিভিন্ন সরকারী অধিদপ্তর এবং এনজিও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং কমিউনিটি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে কিশোর-কিশোরীদের জন্য পুষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের (DGHS) অধীনস্ত জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (IPHN) এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (DSHE) মূলত এই কার্যক্রমটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসায় পরিচালনা ও সমন্বয় করবে, কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে, এবং প্রাপ্ত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কৈশোরকালীন পুষ্টি সেবার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। একইভাবে, জাতীয় পুষ্টিসেবা/জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (IPHN) কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাবে এবং কৈশোর-বান্ধব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই কার্যক্রমটি পরিচালনা ও সমন্বয় করবে, কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে, এবং ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে কৈশোরকালীন পুষ্টি সেবার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

২০২০ সালে জানুয়ারি মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) একটি নতুন ধরণের ভাইরাস জনিত রোগের প্রার্দুভাব ঘোষণা করে, যার সূচনা হয় চীনের হুবেই প্রদেশে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) সংক্রমনকে একটি বৈশ্বিক মহামারি (Pandemic) হিসেবে ঘোষণা করছে। সকল দেশের মত বাংলাদেশেও এই মহামারি মোকাবেলায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সকল ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে। পরিবর্তনশীল বিশ্ব ও জাতীয় পরিস্থিতির আলোকে এবং চলমান করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) সংক্রমন প্রতিরোধ কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, কিশোর-কিশোরীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কোভিড-১৯ সহ অন্যান্য সংক্রমণ রোগ থেকে রক্ষা এবং সেই সাথে সুস্থ্য সবলভাবে বেড়ে উঠার জন্য কি কি করণীয় সে বিষয়টিও "কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম" এর পুষ্টি শিক্ষায় সেশনে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে।

অধ্যায় ১

লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

১.১ লক্ষ্য

১.২ উদ্দেশ্য

১.৩ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

১ লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

১.১ লক্ষ্য

কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। তাদের মধ্যে পুষ্টির উন্নয়ন এবং রক্তস্বল্পতা ও স্থূলতার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা।

১.২ উদ্দেশ্য

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাব এবং কৈশোর-বান্ধব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উপস্থিত ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের জন্য টেকসই এবং উৎকৃষ্ট কার্যক্রম ও সেবা নিশ্চিতকরণ।

১.৩ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাবে এবং কৈশোর-বান্ধব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীর মধ্যে নির্দিষ্ট পুষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ।

- কিশোর কিশোরীদের শারীরিক এবং মানসিক বৃদ্ধির জন্য অণুপুষ্টি গ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সঠিক খাদ্যাভাসের বিষয়ে তাদের অবহিত করা।

- বছর জুড়ে সকল (১০-১৯ বছর বয়সী) কিশোরীদের সাপ্তাহিক আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট (WIFA) প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

- সকল কিশোর-কিশোরীদের কৃমি নিয়ন্ত্রণের জন্য বছরে দু'বার কৃমিনাশক ঔষধ মেবেন্ডাজল (Mebendazole) প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

- ১৮ বছরের আগে মেয়েদের বিয়ে নয়, এ তথ্য কিশোর-কিশোরীদের পাশাপাশি পরিবার এবং বৃহত্তর কমিউনিটিতে পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করা।

- হাড় ও পেশীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য সপ্তাহে কমপক্ষে তিনদিন শারীরিক ব্যায়াম এবং খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করার ব্যবস্থা করা।

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রমের মান উন্নয়ন এবং সেবা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় রিপোর্টিং এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রস্তুত করা।

- অপুষ্টি, রক্তস্বল্পতা এবং অন্যান্য যেসব ক্ষেত্রে চিকিৎসার প্রয়োজন সেগুলোর জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাব এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে রেফারেল ব্যবস্থা চালু করা।

অধ্যায় ২

পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ

২.১ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় (জাতীয় এবং আঞ্চলিক/জেলা পর্যায়)

২.২ স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির অংশগ্রহণ

২.৩ মাধ্যমিক ও উচচ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কিশোর-কিশোরী ক্লাব পরিচালনা

২.৪ মাধ্যমিক ও উচচ মাধ্যমিক বিদ্যালয়/মাদ্রাসা-ভিত্তিক ক্লাবের উপদেষ্টা কমিটি গঠন

২.৫ ব্যবস্থাপক/সেবা প্রদানকারীদের ভূমিকা, দায়িত্ব এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

২.৬ বিদ্যালয়-ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ এবং প্রেরণ

২ পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের কৌশল

বিদ্যালয়ভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বহু খাতের সমন্বয় প্রয়োজন। কেননা প্রতিটি খাতের দায়িত্ব ও ভূমিকা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের গাইডলাইনটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে পুষ্টি কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন অধিদপ্তর, বিভাগ এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার কাজের সমন্বয় কৌশলটি ব্যাখ্যা করেছে। একইসাথে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রোগ্রামের কর্মকর্তা ও অংশীদারগণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ভিত্তিক ক্লাব, মাদ্রাসা, কিশোর-কিশোরীদের কমিউনিটি ক্লাব এবং কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী দপ্তরগুলোর সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণের জন্য এই নীতিমালা রেফারেন্স টুল হিসেবে ব্যবহার করবেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে এই গাইডলাইনটি কর্মভিত্তিক প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করবে।

২.১ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় (জাতীয় এবং আঞ্চলিক/জেলা পর্যায়)

২.১.১ জাতীয় পর্যায়ে সমন্বয় সাধন

দুটি আলাদা মন্ত্রণালয়ের অধীন দুটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের (DGHS) অধীন জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (IPHN) এর জাতীয় পুষ্টিসেবা (NNS) এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (DSHE) মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কিশোর-কিশোরীদের জন্য পুষ্টি কার্যক্রমসমূহ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা হবে।

কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্বদানকারী সংস্থা হলো স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন, জাতীয় পুষ্টিসেবা/জাতীয় পুষ্টি প্রতিষ্ঠান। এই সংস্থা মানসম্মত পুষ্টি সেবা প্রদান এবং তা বজায় রাখার স্বার্থে সকল কৌশলগত বিষয় যেমন: নীতিমালা, সরঞ্জাম, তথ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগ (IEC) উপকরণ, পুষ্টি উপাদান সরবরাহ, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নের দ্বায়িত্বে রয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের দিকনির্দেশনা, পরিচালনা এবং পর্যবেক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে সমন্বয়কারী সংস্থা। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বিদ্যালয়সমূহের বিশুদ্ধ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন এবং পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণে প্রধান জাতীয় সমন্বয়কারী সংস্থা।

স্বাস্থ্যসেবা অধিদপ্তরের অধীনে সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ (সিডিসি) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে দেশের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের (কিশোর-কিশোরী) বছরে দুবার জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ পালন করে আসছে।

সরকারী সংস্থাসমূহসহ সকল অংশীদারগণের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবে:

- জাতীয় পুষ্টিসেবা/জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (IPHN), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (DSHE), মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় (MOWCA)-এর অধীন কিশোর-কিশোরী ক্লাব প্রতিষ্ঠার প্রকল্প অফিস, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভিত্তিক কিশোর-কিশোরীদের ক্লাব পুষ্টি কার্যক্রমের বাস্তবায়নকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহ (এনজিও) এর মধ্যে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন।

২.১.২ আঞ্চলিক/জেলা পর্যায়ের সমন্বয় সাধন

আঞ্চলিক শিক্ষা কার্যালয়ের বিভাগীয় পরিচালক ও আঞ্চলিক স্বাস্থ্য বিভাগের বিভাগীয় পরিচালক, বিভাগীয়/আঞ্চলিক পর্যায়ে সমন্বয় সাধন করবেন এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রমটির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য তত্ত্বাবধান, পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদনের নির্দেশনা প্রদান করবেন। বিভাগীয় পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয় সভায় এই কার্যক্রমের অগ্রগতি যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখবেন।

কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি সেবা প্রদানকারী কর্মীদের কর্মক্ষমতার

উন্নয়ন প্রয়োজন। কৈশোরকালীন পুষ্টি উন্নয়নের ক্ষেত্রে জেলা সিভিল সার্জন অফিস এবং জেলা শিক্ষা অফিস দায়িত্বে থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক, গাইড শিক্ষক, কিশোর-কিশোরী ক্লাবের দলনেতা এবং স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যদের কর্মপরিকল্পনা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে করবে। তারা বিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম ও WASH কর্মসূচির জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের জেলা এবং উপজেলা অফিসগুলোর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

জেলা সিভিল সার্জন অফিস এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জেলা অফিস দায়িত্বে থেকে সেবা প্রদানকারীদের (যেমন: শিশু অধিকার ফ্যাসিলিটেটর, উপজেলা পরিষদ সদস্য (মহিলা), এবং কমিউনিটি ক্লাব নেতা) কার্যক্রম পরিকল্পনা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে যাতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MOWCA) কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাবগুলোতে কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারে।

জেলা সিভিল সার্জন অফিস, জেলা শিক্ষা অফিস এবং জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কিশোর কিশোরীদের ক্লাব এবং কিশোর কিশোরী-বান্ধব স্বাস্থ্যসেবার অবস্থা ও অভিজ্ঞতা জানিয়ে কেন্দ্রের কাছে পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রদান করবে।

আঞ্চলিক/জেলা পর্যায়ে সমন্বয়ের উপযোগী কার্যক্রমসমূহ-

- সিভিল সার্জন অফিস, জেলা শিক্ষা অফিস, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের (DWA) জেলা অফিস, জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস, এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (DPHE) জেলা অফিসের মধ্যে দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন, যেখানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাব এবং কৈশোর-বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং আরও যেসব সহায়তা প্রয়োজন তা নিয়ে আলোচনা হবে।

- এছাড়াও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাব এবং কৈশোর-বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সহায়তা প্রদান করবে।

২.২ স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির অংশগ্রহণ

জেলা সিভিল সার্জনের , এবং জেলা শিক্ষা অফিস স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটিকে (SMC) কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম শুরুর সময়েই এ বিষয়ে জানাবে এবং ধারণাটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে পরিচিত করাবে। SMC বছরব্যাপী এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে এবং বিদ্যালয়ে পুষ্টিবিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম (যেমন পুষ্টি মেলা , বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতার) আয়োজন করবে।

২.৩ মাধ্যমিক পর্যায়ে কিশোর-কিশোরী ক্লাব

২.৩.১ কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন

কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী প্রধান গ্রুপ হচ্ছে মাধ্যমিক বিদ্যালয় কিশোর-কিশোরী ক্লাবসমূহ।

প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠনে নিম্নোক্ত নিয়মগুলো অনুসরণ করবে-

- এই কর্মসূচিতে বাংলাদেশের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণি থেকে ৬জন করে মোট ৩০ জন এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণি থেকে চার থেকে পাঁচ জন করে মোট ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন করা হবে। (স্টুডেন্ট ক্যাবিনেটের সকল সদস্যসহ সদস্য সংখ্যা হবে মোট ৩০ জন)।

- বিদ্যালয়ে পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে ক্লাবের সদস্যদের সহায়তার জন্য প্রধান শিক্ষক প্রথমে ২জন গাইড শিক্ষক (Nodal Teacher) নির্বাচন করবেন। ২জন গাইড শিক্ষক বিজ্ঞান/কৃষি-শিক্ষা/শরীরচর্চা/গার্হস্থ্য-অর্থনীতি শিক্ষকগণের মধ্য থেকে নির্বাচন করা যেতে পারে। গাইড শিক্ষকগণ ক্লাবের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধায়ন করবেন।

- পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষক ও গাইড শিক্ষকগণ মিলিতভাবে ৩০ জনের কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন করবেন। ক্লাবের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

- কো-এডুকশেন বিদ্যালয় হলে ছাত্র-ছাত্রীর ৫০:৫০ অংশগ্রহণ থাকতে হবে।

- প্রতিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাবে দুইজন ক্লাব লিডার থাকবে (একজন ছেলে ও একজন মেয়ে) এবং তারা ক্লাবটি পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত গাইড শিক্ষকগণের সাথে পুষ্টি কার্যক্রম পরিকল্পনা ও পরিচালনা করবে।
- বাকী সদস্যরা ক্লাব লিডারের সাথে মিলিতভাবে শ্রেণিতে পুষ্টি কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
- বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী পুষ্টি র্কাযক্রমে অংশগ্রহণ করবে।
- নতুন নতুন শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ করে দিতে প্রতি ১ বছর অন্তর অন্তর কিশোর-কিশোরী ক্লাবের লিডারগণ ও সদস্যগণ পরিবর্তিত হব। কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত যোগ্যতা অনুসরণ করা হবে;
- সকল/অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য;
- বিদ্যালয়ে পরিচালিত পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা ও সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক;
- অন্যান্য শিক্ষার্থীদের পরিচালিত ও সংগঠিত করার নেতৃত্বের গুণাবলী সমৃদ্ধ, ক্লাব কার্যক্রমে সক্রিয়, জনসমক্ষে বক্তৃতা প্রদানে পারদর্শী এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে দক্ষ।

পরিশেষে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদেরকে তাঁদের সন্তানদের ক্লাব কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করবে এবং সন্তানেরা যেন কিশোর-কিশোরী ক্লাবের গাইড শিক্ষক/শিক্ষিকার অধীনে কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হতে পারে সে বিষয়ে তাঁদের সম্মতি গ্রহণ করবে।

২.৩.২ কিশোর-কিশোরী ক্লাবের কার্যাবলী

- বিদ্যালয় ক্লাবের কার্যক্রমের জন্য একটি শ্রেণিকক্ষ বরাদ্দ করবে, যা কিশোরীদের জন্য নিরাপদ স্থান হবে।
- প্রতি সপ্তাহে একবার (বৃহস্পতিবার) ক্লাবের সকল সদস্য ক্লাবের কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে এক ঘন্টার জন্য একত্রিত হবে।
- প্রতি বৃহস্পতিবার ক্লাব লিডারগণ এবং ক্লাব সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে পুষ্টি সংক্রান্ত কোন একটি বিষয়ে জানবে, আলোচনা করবে এবং কীভাবে তা অন্যান্য শিক্ষার্থীদের কাছে পৌছানো যায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবে।
- প্রতি শনিবার অথবা সপ্তাহের অন্য কোন দিনে নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাব লিডার/ক্লাব সদস্যরা গাইড শিক্ষকদের সহযোগিতায় পুষ্টি সম্পর্কিত কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের অর্জিত জ্ঞান তাদের নিজ নিজ শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর সাথে আলোচনা করবে। সে ক্ষেত্রে গাইড শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- প্রতি শনিবার অথবা সপ্তাহের অন্য কোন দিনে ক্লাব লিডার অ্যাসেম্বলিতে পুষ্টি সম্পর্কিত একটি নির্দিষ্ট বিষয় উপস্থাপন করবে। (যেমন: খাদ্য ও পুষ্টি, খাদ্যের উপাদান ও উৎস, সুষম খাবারের প্রয়োজনীয়তা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, রক্তস্বল্পতা ও তার প্রতিরোধ, ঝরে পড়া রোধ, স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি)।
- পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন সরঞ্জাম যেমন: ফ্লিপ চার্ট (কৈশোরে পুষ্টি-আমার থালা), কিশোর-কিশোরীদের জন্য বুকলেট ইত্যাদি পুষ্টি শিক্ষায় ব্যবহার করা হবে।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে "খাদ্য-পিরামিডের" একটি করে চার্ট বিতরণ করা হবে এবং ক্লাব সদস্যরা (ক্লাব লিডার এবং ক্লাব সদস্যরা) তাদের নিজ নিজ শ্রেণিতে "খাদ্য-পিরামিড" সংক্রান্ত খেলা আয়োজনের মাধ্যমে খাদ্য এবং পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে অবগত করবে। প্রতিটি ক্লাব লিডার তাদের নিজ নিজ শ্রেণিতে দলগতভাবে ১০ জনকে নিয়ে শ্রেণিতে "খাদ্য-পিরামিড" খেলার আয়োজন করবে।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রতি তিন মাস পরপর পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। যেমন: দেয়ালিকা প্রকাশ, পোস্টার তৈরি, পুষ্টি বিষয়ক শ্লোগান, পুষ্টি মেলার আয়োজন ইত্যাদি।
- কিশোর-কিশোরী ক্লাবে ফ্লিপ চার্ট এ প্রদত্ত পুষ্টি শিক্ষা বিষয়ক ১২টি বিষয়ের উপর শিক্ষা প্রদান করা হবে। উক্ত বিষয়গুলো গাইড শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ক্লাব সদস্যরা নিজ নিজ শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের অবগত করবে।
- প্রতি সপ্তাহে একটি বিষয়ে ক্লাবে ও শ্রেণিতে আলোচনা করা হবে। এই পুষ্টি শিক্ষা চক্রটি বছরে ৩ বার করে পুনরাবৃত্তি করা হবে।
- নিজেদের কাজ পরিকল্পনা মাফিক করবে এবং বাকিদেরও ক্লাবের কাজে যোগ দিতে উৎসাহিত করবে। অনিয়মিত সদস্যদের অংশগ্রহণ ও উপস্থিতি নিশ্চিত করবে।

- ক্লাবের সদস্যদের (ক্লাব লিডার ও ক্লাব সদস্য) জন্য একটি ক্লাব রেজিস্টার সংরক্ষণ করবে।
- শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীদের জন্য একটি শ্রেণি রেজিস্টার সংরক্ষণ করবে, যেখানে সকল শিক্ষার্থীর উচ্চতা ও ওজনের পরিমাপ বছরে দুইবার করে রেকর্ড করা হবে।
- কিশোরীদের জন্য সরবরাহকৃত আয়রন ফলিক এসিড (IFA) বিতরণের লক্ষ্যে, গাইড শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে সকল শিক্ষার্থীর তথ্য শ্রেণি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করবে।
- কিশোর-কিশোরীদের কৃমি নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিও গাইড/ শ্রেণি শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে সকল শিক্ষার্থীর তথ্য শ্রেণি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করবে।
- ক্লাব লিডার ও ক্লাব সদস্যরা কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাবসমূহর সাথে সমন্বয় সাধন করবে এবং পুষ্টি সম্পর্কে নিজেদের অর্জিত জ্ঞান তাদের মাঝে ছড়িয়ে দেবে ।
- ক্লাব লিডার ও ক্লাব সদস্যরা পরিবারের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের বাহক হিসেবে এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে আদর্শ মডেল হিসেবে কাজ করবে।
- কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের জন্য ক্লাবের সদস্যগণ তাদের ক্লাব দলনেতার কাছে এবং ক্লাব দলনেতা তাদের গাইড শিক্ষকের কাছে রিপোর্ট প্রদান করবে। IFA বিতরণের লক্ষ্যে, গাইড টিচারদের তত্ত্বাবধানে সকল শিক্ষার্থীর রেজিস্টার সংরক্ষণ করবে।

২.৩.৩ কিশোর-কিশোরী ক্লাবের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (DSHE), জাতীয় পুষ্টিসেবা/ জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (IPHN), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (DWA) সিভিল সার্জনের অফিস, জেলা শিক্ষা অফিস, এবং জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নিম্নোক্ত সরঞ্জামাদির প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে:

- পুস্তিকা, প্রশিক্ষণ মডিউল, ফ্লিপ চার্ট, আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট, সুস্বাস্থ্য কার্ড, তথ্য শিক্ষা এবং যোগাযোগ (IEC) উপকরণ যা জাতীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত ও প্রস্তুতকৃত।
- রিপোর্ট বই ও রেজিস্টারসমূহ।
- খেলাধুলার উপকরণ, সাংস্কৃতিক উপকরণ যেমন: বাদ্যযন্ত্র এবং সাংস্কৃতিক পোশাক।
- পুষ্টির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য উচ্চতা ও ওজন মাপার যন্ত্র এবং বি.এম.আই চার্ট।

২.৪ মাধ্যমিক বিদ্যালয়/মাদ্রাসা-ভিত্তিক উপদেষ্টা কমিটি গঠন

মাধ্যমিক বিদ্যালয়/মাদ্রাসা-ভিত্তিক উপদেষ্টা কমিটি স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির একটি বর্ধিত অংশ। স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির প্রধান, প্রধান শিক্ষক সদস্য সচিব, অন্যান্য এসএমসি সদস্য, গাইড শিক্ষক (বিজ্ঞান/কৃষি/শারীরিক শিক্ষা/গৃহ-অর্থনীতি শিক্ষক), ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের মহিলা কাউন্সেলর, স্বাস্থ্য পরিদর্শক/সহকারী স্বাস্থ্য-পরিদর্শক/স্বাস্থ্য-সহকারী, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক, সিটি কর্পোরেশনের জোন লেভেল থেকে সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং দুজন অভিভাবকের (একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা) সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হবে।

উপদেষ্টা কমিটির দায়িত্ব ও কাজের ধরন:

- বিদ্যালয়গুলোতে পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ওপর সার্বিক পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা।
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন সরকারী বিভাগগুলোর মধ্যে নিয়মিত সমন্বয় নিশ্চিত করা।
- পুষ্টি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ ও সরঞ্জামাদির যোগান নিশ্চিত করা।
- বিদ্যালয়সমূহে কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রমটি শুরু করার পূর্বে কার্যক্রমের উপকারিতা সম্পর্কে অভিভাবকদের জানানো হয়েছে তা নিশ্চিত করা।
- নীতিমালা অনুসারে নথিপত্র ও রেকর্ড সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।
- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) এর জেলা এবং উপজেলা অফিসসমূহে বিদ্যালয়ে পুষ্টি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে WASH এর কর্মসূচিসমূহে সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

- মাসিক প্রতিবেদন জমা দেয়ার কাঠামো এবং সময়সূচী নির্ধারণ করা।
- বিদ্যালয়ে কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রমটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কোন বাধা/বিপত্তি থাকলে সহায়তার মাধ্যমে তা দূরীকরণ নিশ্চিত করা।

২.৫ ব্যবস্থাপক/সেবা প্রদানকারীদের ভূমিকা, দায়িত্ব, এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

২.৫.১ ব্যবস্থাপক/সেবা প্রদানকারীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব

উপ-পরিচালকদের (শিক্ষা - আঞ্চলিক) ভূমিকা ও দায়িত্বঃ

- কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন।
- জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং এই কার্যক্রমে জড়িত অন্যান্য সেবা প্রদানকারীদের জন্য কৈশোরকালীন পুষ্টির উপর কর্মক্ষমতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা।
- প্রতি মাসে পর্যবেক্ষণের তথ্য সন্নিবেশ, যাচাই এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের "মনিটরিং এবং ইভ্যালুয়েশন" উইং-এ প্রেরণ নিশ্চিত করা।
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাবগুলোতে কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণ ও কারিগরী সহায়তা প্রদান।
- জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের সহায়তা সংস্থা এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাবসমূহের মধ্যে কার্যকরী রেফারেল পদ্ধতি নিশ্চিত করা।

সিভিল সার্জনদের ভূমিকা ও দায়িত্বঃ

- কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন।
- জাতীয় পুষ্টি সেবা/জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের সাথে কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রমের সমন্বয় এবং অগ্রগতি পর্যালোচনা নিশ্চিত করা এবং কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পুষ্টি উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- জেলা-ভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রমের বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণের পরিকল্পনা করা।
- প্রতি মাসে পর্যবেক্ষণের তথ্য সন্নিবেশ, যাচাই এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানে অবস্থিত পুষ্টি তথ্য ও পরিকল্পনা ইউনিটে এবং বিভাগীয় স্বাস্থ্য অফিসে প্রেরণ নিশ্চিত করা।
- সুপারভাইজার এবং সেবা প্রদানকারীদের জন্য কৈশোরকালীন পুষ্টির উপর কর্মক্ষমতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা।
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাব এবং কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণ ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করা।
- জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের সহায়তা সংস্থা এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাবসমূহের মধ্যে কার্যকরী রেফারেল পদ্ধতি নিশ্চিত করা।

উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনার ভূমিকাঃ

- জেলা সিভিল সার্জন অফিস কর্তৃক আয়োজিত কৈশোরকালীন পুষ্টি বিষয়ক সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করা।
- FWA-এর গৃহ পরিদর্শনকালে কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টির উপর কাউন্সেলিং-এর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা।
- জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের সহায়তা সংস্থা এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাবসমূহের মধ্যে কার্যকরী রেফারেল সিস্টেমের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

জেলা শিক্ষা অফিসারের ভূমিকা ও দায়িত্বঃ

- জেলা সিভিল সার্জন অফিস কর্তৃক আয়োজিত কৈশোরকালীন পুষ্টি বিষয়ক সমন্বয় সভায় উপস্থিত থেকে

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের তথ্যসমূহ উপস্থাপন করা।

- উপজেলা পর্যায়ে এটা নিশ্চিত করা যেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, থানা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার গাইডলাইন অনুসারে কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টির উপর প্রশিক্ষণ পায় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও যেন তারা সে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।
- কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান (আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট) সরবরাহের লক্ষ্যে সিভিল সার্জন অফিসের সাথে সমন্বয় রক্ষা করা।
- গাইডলাইনটির মনিটরিং এবং ইভ্যালুয়েশন-নীতিমালা অনুসারে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো থেকে যাতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, থানা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজাররা কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রতিবেদন সংগ্রহ করেন তা নিশ্চিত করা।

  কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি কার্যক্রমের মানসম্পন্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে পর্যায়ক্রমিক পরিদর্শন করা এবং পরিদর্শনের ফলাফল পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা।

প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্বঃ

- বিদ্যালয়ে পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে ক্লাবের সদস্যদের সহায়তার জন্য ২জন গাইড শিক্ষক (Nodal Teacher) নির্বাচন করবেন। ২জন গাইড শিক্ষক বিজ্ঞান, কৃষিশিক্ষা, শরীরচর্চা, গার্হস্থ্য-অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষকগণের মধ্য থেকে নির্বাচন করা যেতে পারে। গাইড শিক্ষকগণ ক্লাবের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান করবেন।
- বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণি শিক্ষককে পুষ্টি কার্যক্রমের ব্যাপারে অবহিত করার লক্ষ্যে জ্ঞান প্রদান করা।
- নিয়মিত শ্রেণি রুটিনের মধ্যেই কিশোর-কিশোরী ক্লাবের কার্যক্রম এবং পুষ্টি শিক্ষা সেশনের জন্য সময় ও স্থান নিশ্চিত করা।
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রমটির প্যাকেজ সম্পর্কে অন্যান্য শ্রেণি শিক্ষক, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং SMC সদস্যদের অবহিতকরণ নিশ্চিত করা।
- বিদ্যালয়ে পুষ্টি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক ও পুষ্টি সরঞ্জামের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।
- নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ কার্যক্রমে সকলের (SMC, শিক্ষক, ও শিক্ষার্থী) অংশগ্রহণ এবং সমন্বয় নিশ্চিত করা।
- প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর অভিভাবক দিবসের আয়োজন করা এবং কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টির বিভিন্ন বিষয় এবং আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেটের গুরুত্ব সম্পর্কে জোর দেয়া।

গাইড শিক্ষকদের ভূমিকা ও দায়িত্বঃ

- ক্লাব গঠন ও কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা।
- বিদ্যালয়ে কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা।
- ক্লাব লিডারদের পাক্ষিক রিভিউ মিটিং- এর নির্দেশনা দেয়া।
- রেকর্ড সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রদান সম্পর্কে ক্লাব লিডারদের অবহিত করানো, সহায়তা প্রদান এবং তত্ত্বাবধান করা।
- শ্রেণিকক্ষের সেশনের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীদের জন্য পুষ্টি সংক্রান্ত নির্দিষ্ট পাঠ প্রস্তুত করতে ক্লাব লিডার এবং ক্লাব সদস্যদের সহায়তা করা।
- পুষ্টি শিক্ষায় শ্রেণিকক্ষ এবং ক্লাবসমূহে নিয়মাবলীর অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- পুষ্টি শিক্ষার বাইরে অন্যান্য পুষ্টি কার্যক্রম, যেমন- সাপ্তাহিক আয়রন ফলিক এসিড সাপ্লিমেন্টেশন (WIFA), বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রচারণা, জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ কর্মসূচি, শারীরিক ব্যায়াম ইত্যাদির পদ্ধতিগত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- স্বাস্থ্যব্যবস্থাপনা, নিরাপদ পানি, পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির কাছে সুযোগ-সুবিধার চাহিদা উত্থাপনের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন দাখিল করা।
- রক্তস্বল্পতা ও অপুষ্টিতে ভোগা কিশোর-কিশোরী, যাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা সেবার প্রয়োজন তাদের জন্য রেফারেল পদ্ধতি তৈরি এবং চালু করা।

- মাসের শেষে শ্রেণি রেজিস্টারে সংরক্ষিত তথ্য অনুযায়ী গাইড শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ের প্রদত্ত মাসিক প্রতিবেদন রেজিস্টারে বিদ্যালয়ের মাসিক প্রতিবেদন তৈরি করবেন। পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষক যাচাই করার পর প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষরিত মাসিক প্রতিবেদন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে জমা দিবেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভূমিকা ও দায়িত্ব:

- সাপ্তাহিক আয়রন ফলিক এসিড বিতরণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত "সুস্বাস্থ্য কার্ড" ১০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী ছাত্রীদের মাঝে বিতরণ করা, যেখানে তারা তাদের আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট এবং কৃমিনাশক ট্যাবলেট গ্রহণের তথ্য সংরক্ষণ করবে। আয়রন ফলিক ট্যাবলেট বিতরণ ও পুষ্টি শিক্ষায় উপস্থিতি শ্রেণি রেজিস্টারে যথাযথভাবে রেকর্ড রাখা।
- যে কিশোরীরা আয়রন ফলিক ট্যাবলেট পায়নি, তাদের কাছে আয়রন ফলিক ট্যাবলেট পৌঁছে দেয়ার জন্য গাইড শিক্ষকদের সাথে সমন্বয় সাধন করা।
- সকল শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নিজ নিজ শ্রেণিতে নির্দিষ্ট বিষয়ে পুষ্টি শিক্ষা প্রদানের জন্য সপ্তাহে একটি দিন এবং সময় নির্দিষ্ট করতে ক্লাব সদস্যদের সহায়তা করা।

স্বাস্থ্য পরিদর্শক (HI) এবং সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শকের (AHI) ভূমিকা ও দায়িত্ব:

- প্রয়োজন অনুসারে পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্কুল ম্যানেজমেণ্ট কমিটির সমর্থন আদায়।
- কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন এবং ক্লাব সদস্য নির্বাচনে বিদ্যালয়কে সহায়তা করা।
- জেলা স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার (DHEO) এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারদের (USEO/TSEO/UAS) সমন্বয়ে এবং সম্মিলিত করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গাইড শিক্ষক, ক্লাব লিডার এবং ক্লাব সদস্যদেরকে কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- বিদ্যালয়গুলোতে কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ (আয়রন ফলিক সাপ্লিমেন্টেশন, মেবেনডাজল ট্যাবলেট, IEC উপকরণসমূহ)-এর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।
- বিদ্যালয়ে আয়রন ফলিক ট্যাবলেটের বিতরণ, কৃমি নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি এবং পুষ্টি শিক্ষা সেশনের রেকর্ড এবং প্রতিবেদন নিশ্চিত করা।
- অপুষ্টি, রক্তস্বল্পতা ইত্যাদি রোগে ভোগা শিক্ষার্থী যাদের চিকিৎসা সেবা প্রয়োজন, তাদের জন্য বিদ্যালয় এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর মধ্যে রেফারেল যোগাযোগ স্থাপনায় সহায়তা করা।
- জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ এবং অন্যান্য জাতীয় দিবসসমূহে বিদ্যালয়ে পুষ্টি মেলা আয়োজনে সহায়তা করা (এ সংক্রান্ত অন্যান্য দপ্তরকে সংযুক্ত করে)।
- পুষ্টি কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য পর্যায়ক্রমিকভাবে পর্যবেক্ষণমূলক পরিদর্শন করা।
- নিজ তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়সমূহ থেকে মাসিক প্রতিবেদন সংগ্রহ এবং সংকলন করে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসারদের মাধ্যমে সিভিল সার্জনের কাছে পৌঁছানো।
- বিদ্যালয়সমূহে কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের সাথে সমন্বয় করা।
- নিরাপদ খাদ্যাভাস, পুষ্টিকর খাবার প্রস্তুতকরণ, বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর প্রভাব, অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি, স্থূলকায় হয়ে যাওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে সামাজিক জ্ঞান, সচেতনতা এবং আচরণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে মাসিক বৈঠক এবং অভিভাবক সভার পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন করা।

সিনিয়র/জুনিয়র জেলা স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসারের (HEO) ভূমিকা এবং দায়িত্ব:

- স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শকের সাথে সমন্বয় করে নিজ কর্মক্ষেত্রের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে মাসিক পুষ্টিবিষয়ক সেশনের পরিকল্পনা করা।
- অভিভাবক সভায় উপস্থিত থেকে পুষ্টি বিষয়ে সেশন পরিচালনা করা।

- স্কুল ম্যানেজমেণ্ট কমিটির সদস্যবৃন্দ, প্রধান শিক্ষক, গাইড শিক্ষক, ক্লাব লিডার এবং ক্লাব সদস্যদের অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণে সহায়তা করা এবং তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- অপুষ্টি, রক্তস্বল্পতায় ভোগা কিশোর-কিশোরী এবং গর্ভবতী কিশোরীদেরকে সঠিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফার করার জন্য গাইড শিক্ষককে সহায়তা প্রদান করা।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের (USEO) / থানা শিক্ষা অফিসার (TSEO) / উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার (UAS)-এর ভূমিকা ও দায়িত্বঃ

- স্কুল ম্যানেজমেণ্ট কমিটি এবং প্রধান শিক্ষকদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে ক্লাব গঠন এবং গাইড শিক্ষক মনোনীত করা।
- স্বাস্থ্য পরিদর্শক অথবা সহকারি স্বাস্থ্য পরিদর্শকের সাথে স্কুল ম্যানেজমেণ্ট কমিটির সদস্যবৃন্দ, প্রধান শিক্ষক, গাইড শিক্ষক, ক্লাব লিডার ও ক্লাব সদস্যদের অবহিতকরণ এবং প্রশিক্ষণে সহায়তা এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- বিদ্যালয়ে পুষ্টিমেলা অনুষ্ঠানে সহায়তা করা (এ সংক্রান্ত অন্যান্য দপ্তরকে সম্পৃক্ত করে)।
- পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে বিদ্যালয়সমূহে নিয়মিত তদারকি করা।
- বিদ্যালয়সমূহে পুষ্টি কার্যক্রম প্যাকেজ এবং কার্যকরী প্রতিবেদন ব্যবস্থার বাস্তবায়নে জেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসের সাথে সমন্বয় রক্ষা করা।
- বিদ্যালয়ে পুষ্টি কার্যক্রমের সমর্থনে WASH সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনায় স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপজেলা অফিসের সাথে সমন্বয় রক্ষা করা।
- কৃমিনাশক কর্মসূচি পরিচালনা এবং প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার (CDC) সাথে সমন্বয় রক্ষা করা।

স্বাস্থ্য সহকারী (HA) এবং উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (SACMO)/পরিবার কল্যাণ সহকারী (FWA)-এর ভূমিকা ও দায়িত্বঃ

- শিক্ষার্থীদের অভিভাবক এবং কমিউনিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে নিয়ে সুষম খাদ্যাভাস, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবার প্রস্তুতকরণ, কৈশোরকালীন পুষ্টির উপর বাল্যবিবাহের প্রভাব, অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি, মুটিয়ে যাওয়া ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সামাজিক জ্ঞান, সচেতনতা এবং আচরণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে মাসিক সভার পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন করা।
- মাসিক সভার পরিকল্পনাগুলো স্বাস্থ্য পরিদর্শক, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শকের সাথে সমন্বয় করে তৈরি করা যাতে করে একই কাজ দুইবার না করতে হয় এবং অধিক জায়গায় পৌঁছানো যায়।
- অপুষ্টি, রক্তস্বল্পতায় ভোগা কিশোর-কিশোরী এবং গর্ভবতী কিশোরীদেরকে সঠিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির জন্য কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে রেফার করা।
- স্বাস্থ্য পরিদর্শক, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শকের সাথে সমন্বয় করে মাসিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের পরিকল্পনা তৈরী করা।

জেলা ও উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তাদের ভূমিকা ও দায়িত্বঃ

- কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রমটির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণের জন্য উপজেলা ও জেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা স্বাস্থ্য পরিদর্শকের কাছ থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম, যেমন: কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাব থেকে রিপোর্টিং প্রতিবেদনগুলো গ্রহণ করবেন এবং এই কার্যক্রমটির মনিটরিং এবং ইভ্যালুয়েশন নির্দেশিকা অনুযায়ী MIS সিস্টেমে প্রবেশ করানোর দায়িত্ব পালন করবেন।
- MIS সিস্টেম তৈরির পূর্ব পর্যন্ত পরিসংখ্যানবিদেরা স্বাস্থ্য পরিদর্শকের কাছ থেকে ম্যানুয়াল রিপোর্ট নিয়ে একত্রিত এবং সংরক্ষণ করবেন এবং তা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানে অবস্থিত পুষ্টি তথ্য ও পরিকল্পনা ইউনিটে পৌঁছে দেবেন।

২.৫.২. ব্যবস্থাপক এবং সেবা প্রদানকারীদের কর্মদক্ষতার উন্নয়ন

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রমটি পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পদক্ষেপ হলো সচেতনতা। কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদের স্ব-স্ব ভূমিকা অনুসারে বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জড়িত কর্মীদের পরিচিত করানো এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা। জাতীয় পুষ্টিসেবা/জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর যৌথভাবে সেবা প্রদানকারী ও ব্যবস্থাপকদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত করার জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচিসমূহ সুপারিশ করা হলো।

মাস্টার ট্রেইনার তৈরি: বিদ্যালয় ও কমিউনিটিতে কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রমের সঠিক বাস্তবায়নের জন্য মাস্টার ট্রেইনার তৈরি করতে হবে। জাতীয় পুষ্টিসেবা/ জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো থেকে মাস্টার ট্রেইনার নির্বাচন করবে। জাতীয় পুষ্টিসেবা/জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মাস্টার ট্রেইনারদের জন্য যৌথভাবে একটি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের (Training of the Trainers) ব্যবস্থা করবেন, যেন তাঁরা পরবর্তীতে কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রমটির উপর ব্যবস্থাপক ও সেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন প্রদান করতে পারেন। জাতীয়, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করার জন্য TOT তে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ নিতে পারবেন:

- জেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা সিভিল সার্জন কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি
- উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (আঞ্চলিক) বিদ্যালয়/কলেজ
- জেলা শিক্ষা অফিসার
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত প্রশিক্ষক

- **অবহিতকরণ কর্মসূচি (জাতীয়, জেলা এবং উপজেলা):** এর মাধ্যমে জেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, জেলা ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং প্রধান শিক্ষকদেরকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হবে। এই কর্মসূচি জাতীয় পুষ্টিসেবা/জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের কারিগরি সহায়তা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সহায়তায় অনুষ্ঠিত হবে। মাস্টার ট্রেইনাররা স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা ব্যবস্থাপক এবং সেবা প্রদানকারীদের জন্য এই অবহিতকরণ কর্মসূচি পরিচালনা করবেন। এই কর্মসূচিতে উৎস নথি হিসেবে অনুমোদিত কৈশোরকালীন পুষ্টি প্রশিক্ষণ মডিউলটি ব্যবহৃত হবে। পরিচিতি কর্মসূচিটি মূলত কার্যক্রমের মানসম্পন্ন বাস্তবায়ন এবং একটি কার্যকরী পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপরে জোর দেবে।

- **গাইড শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ:** উপজেলা স্তরে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি বছরে একবার করে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার অথবা মনোনীত মেডিকেল অফিসারের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে। কৈশোরকালীন পুষ্টি প্রশিক্ষণ মডিউল, তথ্য ও যোগাযোগ শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষকদের জন্য পুস্তিকা ইত্যাদি এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ব্যবহৃত হবে।

- **কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণ:** স্বাস্থ্য ও শিক্ষা উপজেলা অফিসার অথবা জাতীয় পর্যায়ের মাস্টার ট্রেইনারদের সহায়তায় গাইড শিক্ষকেরা প্রতিবছর একবার করে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি পরিচালনা করবেন। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক পুস্তিকা, তথ্য ও যোগাযোগ শিক্ষাবিষয়ক উপকরণ, শিক্ষামূলক বিনোদন উপকরণ ইত্যাদি ব্যবহৃত হবে।

- **সকল শিক্ষকদের জন্য পরিচিত কর্মসূচি:** প্রধান শিক্ষক, স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারদের সহায়তায় এই পরিচিতি কর্মসূচিটি গাইড শিক্ষক পরিচালনা করবেন।

- **সকল শিক্ষার্থীর জন্য পরিচিতি কর্মসূচি:** কিশোর-কিশোরীরা ক্লাব কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে এই ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচিটি খুবই প্রয়োজনীয়। বিদ্যালয়ের প্রতি পঞ্জিকাবর্ষের শুরুতে এটি করা যেতে পারে।

- **অভিভাবকদের জন্য ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি:** অভিভাবক সভার অংশ হিসেবে প্রত্যেক পঞ্জিকাবর্ষের শুরুতে পুষ্টি বিষয়ে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে।

- **কিশোর-কিশোরী ক্লাব সদস্যদের জন্য রিফ্রেশার ট্রেনিং:** শ্রেণিকক্ষ সেশনে সমাধান না হওয়া ইস্যুসমূহের সমাধানমূলক কর্মশালা হিসেবে এই রিফ্রেশার ট্রেনিং বছরে দুইবার অনুষ্ঠিত হতে পারে। উপজেলা স্তরের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা অফিসসমূহের সহায়তায় গাইড শিক্ষকেরা এই রিফ্রেশার ট্রেনিং পরিচালনা করবেন।

২.৬. বিদ্যালয়ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ এবং প্রেরণ:

১. প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে ছাত্রীদের মাঝে "সুস্বাস্থ্য কার্ড" বিতরণ করা হবে, যেখানে তারা তাদের আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট এবং কৃমিনাশক ট্যাবলেট (মেবেন্ডাজল ৫০০ মি. গ্রা.) গ্রহণের তথ্য সংরক্ষণ করবে।

২. শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীদের জন্য একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হবে যেখানে সকল শিক্ষার্থীর উচ্চতা, ওজন ও বি এম আই পরিমাপ করে বছরে দুইবার রেকর্ড করা হবে।

৩. প্রস্তুতকৃত তালিকা অনুসারে কিশোর-কিশোরীদের জন্য সরবরাহকৃত আয়রন ফলিক এসিড (IFA) এবং কৃমিনাশক ট্যাবলেট (মেবেন্ডাজল ৫০০ মি. গ্রা.) বিতরণের তথ্য একই রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা হবে।

৪. মাসের শেষে শ্রেণি রেজিস্টারে সংরক্ষিত তথ্য অনুযায়ী গাইড শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ের প্রদত্ত মাসিক প্রতিবেদন রেজিস্টারে বিদ্যালয়ের মাসিক প্রতিবেদন তৈরি করবেন। পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষক যাচাই করার পর প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষরিত মাসিক প্রতিবেদন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে জমা দেবেন।

৫. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণ মাসিক প্রতিবেদন সংকলন করে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে জমা দেবেন।

৬. জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জেলা ভিত্তিক মাসিক প্রতিবেদন বিভাগীয় স্বাস্থ্য ও শিক্ষা অফিসে জমা দেবেন।

৭. বিভাগীয় শিক্ষা অফিস জেলাভিত্তিক কৈশোরকালীন কার্যক্রমের মাসিক প্রতিবেদন মনিটরিং এবং ইভ্যালুয়েশন উইং এ প্রেরণ করবেন।

৮. অনুরূপভাবে বিভাগীয় স্বাস্থ্য অফিস উক্ত জেলাভিত্তিক কৈশোরকালীন কার্যক্রমের মাসিক প্রতিবেদন Nutrition Information and Planning Unit (NIPU)-এ প্রেরণ করবেন।

অধ্যায় ৩

কিশোর-কিশোরীদের জন্য পুষ্টি কার্যক্রম

৩.১ স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস উন্নয়নে পুষ্টি শিক্ষা

৩.২ ওজন, উচ্চতা এবং বি.এম.আই মনিটরিং

৩.৩ সাপ্তাহিক আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট সরবরাহ (WIFA)

৩.৪ কৃমি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

৩.৫ বিদ্যালয় ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে রেফারাল পদ্ধতি স্থাপন

৩.৬ শরীরচর্চা কার্যক্রম প্রচার

৩ কিশোর-কিশোরীদের জন্য পুষ্টি কার্যক্রম

কৈশোরকালীন পুষ্টি সহায়িকা (এনএনএস, আইপিএইচএন ২০১৮) ৮টি বিষয়ের রূপরেখা দিয়েছে: কৈশোরকাল এবং বয়ঃসন্ধিকাল কী; কৈশোরকালীন পুষ্টিগত অবস্থা; কিশোর-কিশোরীদের খাদ্য ও পুষ্টি; অপুষ্টিজনিত সমস্যা ও তার প্রতিরোধ; নিরাপদ পানি ও খাদ্য; ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি; বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ; এবং নবজাতকদের যত্নসহ গর্ভাবস্থায় পরিচর্যা। কৈশোরকালীন পুষ্টি সম্পর্কিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) বিদ্যমান কার্যক্রমগুলো এবং নীতিগুলোকে ৮টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো: স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাসের প্রচার; খাদ্য সমৃদ্ধকরণের মাধ্যমে প্রধান খাবারের সাথে অণুপুষ্টি সরবরাহ করা; তীব্র অপুষ্টিজনিত সমস্যা মোকাবেলা করা; বাল্যবিবাহকে প্রতিরোধ করা; কৈশোরকালীন গর্ভাবস্থা এবং এর ফলাফল প্রতিরোধ করা; গর্ভপূর্ব ও গর্ভকালীন পুষ্টি উন্নত করা; নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সহজলভ্য করা; বিভিন্ন শরীরচর্চা কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা; এবং রোগ প্রতিরোধ ও মোকাবিলা করা।

বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীদের জন্য পুষ্টি কার্যক্রম প্যাকেজ বলতে নিম্নের ৬টি কার্যক্রমকে বোঝানো হয়েছে, যা বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং করা সম্ভব। এই পুষ্টি কার্যক্রম ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের জন্য সকল পর্যায়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাব এবং কৈশোর-বান্ধব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বাস্তবায়ন করা হবে।

- পুষ্টি শিক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস উৎসাহিত করা।
- ওজন, উচ্চতা এবং বি.এম.আই মনিটরিং করা।
- সাপ্তাহিক আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট সরবরাহ করা।
- কৃমি নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি
- অপুষ্টি, রক্তস্বল্পতা এবং পুষ্টি ঘাটতি জনিত কারণে স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজন, তাদের রেফারেল ব্যবস্থা করা।
- শরীরচর্চা কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।

৩.১ স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস উন্নয়নে পুষ্টি শিক্ষা

বাংলাদেশে পুষ্টিহীনতার প্রাথমিক কারণ খাদ্যের মাধ্যমে পুষ্টি গ্রহণের অপর্যাপ্ততা। যদিও বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যচিত্রের তথ্য এখনও অপ্রতুল, তবুও ১৯৯৯ সালে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, শহরের বিদ্যালয় ছাত্রীদের মধ্যে "Recommended Dietarz Allowance (RDA)" এর মানদণ্ড অনুযায়ী যথাক্রমে মাত্র ৯% শর্করা এবং ১৭% প্রোটিন সম্বলিত খাবার গ্রহণ করে[১]। ২০১২ সালে প্রকাশিত "Shen and Hoque" এর গবেষণা থেকে আমরা জানতে পারি যে, বাংলাদেশে অপুষ্টির প্রাথমিক অন্তর্নিহিত কারণ হিসাবে পাওয়া গিয়েছে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য। সাম্প্রতিক তথ্য (এফএসএনএসপি, ২০১৩) থেকে আমরা দেখতে পাই যে, খাদ্য ঘাটতির ক্ষেত্রে মহিলারা তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দিকে তাকিয়ে প্রথমে নিজেরাই খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন।

মূলত কৈশোরকালই হচ্ছে সঠিক খাদ্যাভ্যাস তৈরির সঠিক সময়। কিশোর-কিশোরীরা সাধারণত নতুন ধারণা নেয়ার ব্যাপারে উদ্‌গ্রীব থাকে এবং কৌতূহল প্রকাশ করে। আগ্রহের সাথে গৃহীত অভ্যাসগুলো সাধারণত আজীবন স্থায়ী হয়। সর্বোপরি, বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে কিশোর-কিশোরীরা পরিবার থেকে প্রাপ্ত খাদ্যাভ্যাসের তুলনায় তাদের ব্যক্তিগত পছন্দগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে এবং তারা কখন, কোথায় কী খায় তার উপর ক্রমে আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে[২]। মূলত কৈশোরকালীন পুষ্টি আচরণের উন্নতি করাই হলো প্রাপ্তবয়স্কদের স্বাস্থ্যের জন্য বিনিয়োগ করা।

গাইড শিক্ষক ক্লাব লিডারদের সাথে নিয়ে সকল শ্রেণির জন্য একটি ত্রৈমাসিক পুষ্টি শিক্ষা অধিবেশন করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করবেন এবং সেই অনুযায়ী প্রতি বৃহস্পতিবার ক্লাবের জন্য

[1] Ahmed et al., 1998

[2] Thomas 1991; Shepherd and Dennison, 1996; Spear 1996

নির্ধারিত সময়ে ক্লাব সদস্যদের নিয়ে পুষ্টি শিক্ষার উপর সাপ্তাহিক প্রস্তুতিমূলক অধিবেশন পরিচালনা করবেন। গাইড শিক্ষকদের সাথে ক্লাব লিডার এবং ক্লাব সদস্যরা পূর্ব-নির্ধারিত বিষয়ে নিজ নিজ শ্রেণিতে সাপ্তাহিক পুষ্টি শিক্ষা সেশন পরিচালনা করবেন। একটি চক্র সম্পূর্ণ করতে তিন মাস প্রয়োজন, যা সারা বছর জুড়ে মোট চারবার পুনরাবৃত্তি করা হবে।

পুষ্টি শিক্ষা অধিবেশনগুলি একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিচালনা করা হবে, যেমন: উপস্থাপনা এবং আলোচনা পর্ব, কুইজ, বিতর্ক, গেমস, বুকলেট এবং মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে বিনোদন ভিত্তিক শিক্ষা ইত্যাদি।

সুনির্দিষ্টভাবে কেবল এই বিষয়গুলো না হলেও নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পুষ্টি শিক্ষার অধীনে অগ্রাধিকার পেতে পারে:

- খাদ্য এবং পুষ্টি: সুষম খাদ্য
- স্থুলতা প্রতিরোধের গুরুত্ব
- আয়রনের অভাবজনিত রক্তস্বল্পতা নিয়ন্ত্রণ
- আয়োডিন এবং অন্যান্য অণুপুষ্টির ঘাটতি প্রতিরোধ
- বাল্যবিবাহের ফলাফল এবং এর প্রতিরোধ
- মাসিকের সময় কিশোরীদের পুষ্টিকর খাবারের প্রয়োজনীয়তা
- করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) সংক্রমন প্রতিরোধে স্বাস্থ্য সম্মতভাবে জীবন যাপন ও পুষ্টিকর খাবারের প্রয়োজনীয়তা
- স্বাস্থ্যবিধি মানা এবং পুষ্টিকর খাবার প্রস্তুতির অনুশীলন

৩.২ ওজন, উচ্চতা এবং বি.এম.আই মনিটরিং

একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের মোট উচ্চতার ১৫-২০% এবং শরীরের কাঠামোর ৪৫% বৃদ্ধি সাধন হয় কৈশোরকালীন সময়ে[৩]। কৈশোরকালীন সময়ে শরীরের হাড়ের গঠনের ৯০% সম্পন্ন হয়। পুষ্টি বিশেষত শৈশব এবং কৈশোর জুড়ে বৃদ্ধি এবং বিকাশের উপর প্রভাব ফেলে; আর এজন্যই কিশোরাবস্থায় পুষ্টির চাহিদা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ[৪]।

কৈশোরে ৮০% এরও বেশি বৃদ্ধি (ওজন এবং উচ্চতা) কিশোর থাকাকালীন সময়ের শুরুর দিকেই (১০-১৫ বছর) হয়। শৈশবকালীন বৃদ্ধির ঘাটতিগুলো পূরণের জন্য কৈশোরকালীন বৃদ্ধিকে গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। এই কৈশোরকালীন বৃদ্ধির সাথে কগনিটিভ, ইমোশনাল এবং হরমোনাল ব্যাপারগুলোও জড়িত। একটি মেয়ের কৈশোরকালের উচ্চতা বৃদ্ধি সাধারণত ১০ বছর বয়স থেকে শুরু হয় এবং তা কারো কারো ক্ষেত্রে প্রায় ১২ বছর অবধি সবচেয়ে দ্রুত গতিতে ঘটে। কিন্তু একটি ছেলের কৈশোরকালীন উচ্চতা বৃদ্ধি শুরু হয় ১২ বছর বয়স থেকে এবং এক বা দুই বছরে তা মেয়েদের বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে যায়। একটি মেয়ে তার পূর্ণ উচ্চতা সাধারণত ১৬ বছর বয়সের মধ্যে অর্জন করে, যা একটি ছেলে অর্জন করে ১৮ বছর বয়সে।

বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের বৃদ্ধির জন্য তাদের উচ্চতা পরিমাপ করা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই উচ্চতা তাদের কৈশোরকালেই অর্জন করার কথা।

ওজন ও উচ্চতা পরিমাপ

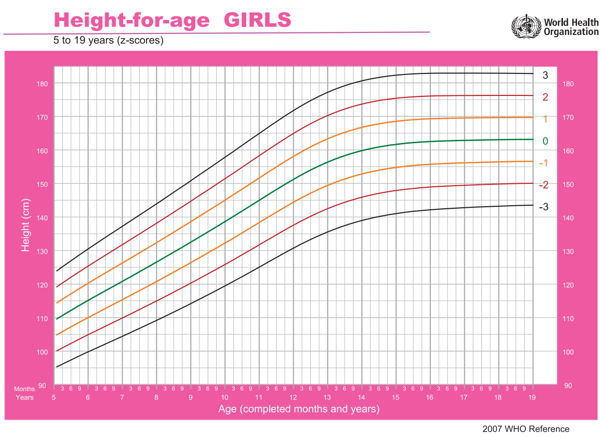

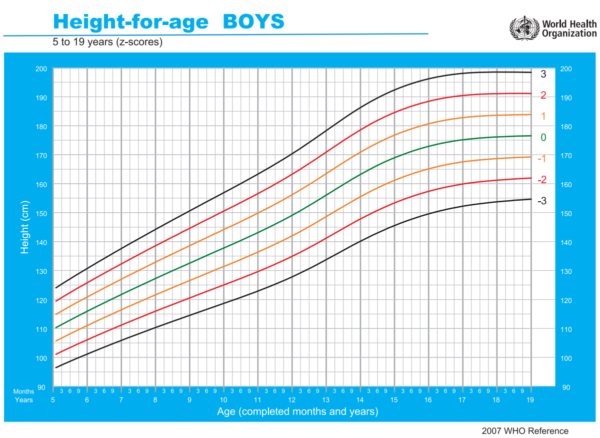

[3] Rees and Christine, 1989

[4] Lifshitz, Tarim and Smith, 1993

- কিশোর-কিশোরী ক্লাবের ক্লাব লিডার/ক্লাব সদস্যরা ওজন ও উচ্চতা পরিমাপ করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে।
- উচ্চতা মাপার ফিতা দেয়ালের একটি উপযুক্ত স্থানে থাকবে যেন যে কোন শিক্ষার্থীর উচ্চতা খুব সহজেই নির্ধারণ করা যায়। ওজন মাপার স্কেলের মাধ্যমে সহজেই ওজন নির্ধারণ করা যাবে।
- বিদ্যালয় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বছরের শুরুতে ক্লাব লিডার/ক্লাব সদস্যরা একটি পূর্বনির্ধারিত সপ্তাহে ওজন ও উচ্চতা পরিমাপের অধিবেশনটি আয়োজন করবে এবং সমস্ত শিক্ষার্থীকে তাদের ওজন ও উচ্চতা পরিমাপের জন্য আমন্ত্রণ জানাবে।
- সকল শিক্ষার্থীর ওজন ও উচ্চতা একটি শ্রেণি রেজিস্টার/ডিজিটাল সিস্টেমে রেকর্ড করা হবে।
- কিশোর-কিশোরীদের দৈহিক বিকাশের অগ্রগতি জানার জন্য এবং সমস্ত কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে পুষ্টি কার্যক্রমের প্রভাব বোঝার জন্য প্রতি বছর ছয় মাসের ব্যবধানে এই অনুশীলনটির পুনরাবৃত্তি করা হবে।

বডি মাস ইনডেক্স (বি.এম.আই)

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) বয়স-ভিত্তিক বিএমআই ব্যবহার করে Adolescent Growth Standard-এর ভিত্তিতে কৃশতা এবং অতিরিক্ত ওজন এবং স্থুলতা চিহ্নিত করা হয়[৫]।

বি.এম.আই পরিমাপ

ধরা যাক, একজন কিশোরীর বয়স ১২ বছর, ওজন ২৮ কেজি এবং উচ্চতা ১.২৫ মিটার। নিম্নলিখিত সূত্র ব্যবহার করে সেই কিশোরীর প্রাপ্ত বি.এম.আই হয় ১৭.৯২। এটি থেকে বোঝা যায় যে, তার বৃদ্ধি স্বাভাবিক মাত্রায় আছে।

ওজন (কেজি)   ২৮

বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই)) = --------= -------- = ১৭.৯২

উচ্চতা (মিটার^{২})   ১.২৫ x ১.২৫

এইভাবে সমস্ত শিক্ষার্থীর ওজন, উচ্চতা এবং বডি মাস

ইনডেক্স (বি.এম.আই) একটি রেজিস্টার বইতে রেকর্ড করা হবে এবং বছরের মধ্যে দুবার বিএমআই চার্টে প্লট করা হবে। এই বি.এম.আই নির্ণয় করার সূত্র এবং (WHO) বিএমআই চার্ট ব্যবহার করে কীভাবে বিএমআই পরিমাপ করতে হয় এবং পুষ্টির অবস্থা বুঝতে হয় তা তাদেরকে শেখানো হবে।

WHO বিএমআই চার্টের প্লটের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরী তার পুষ্টি অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবে এবং পুষ্টি শিক্ষা থেকে সঠিক পুষ্টির অবস্থানে পৌঁছানোর জন্য করণীয় খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে জানতে পারবে।

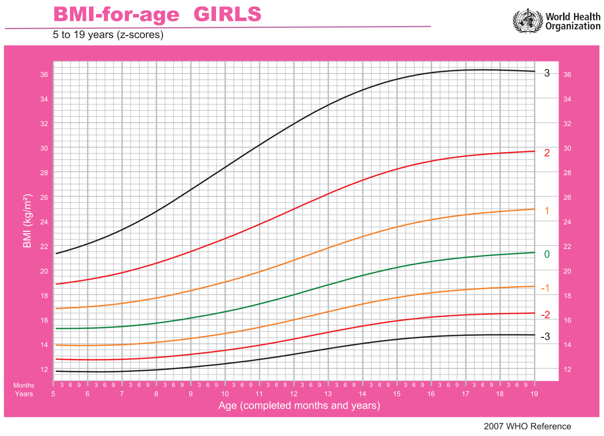

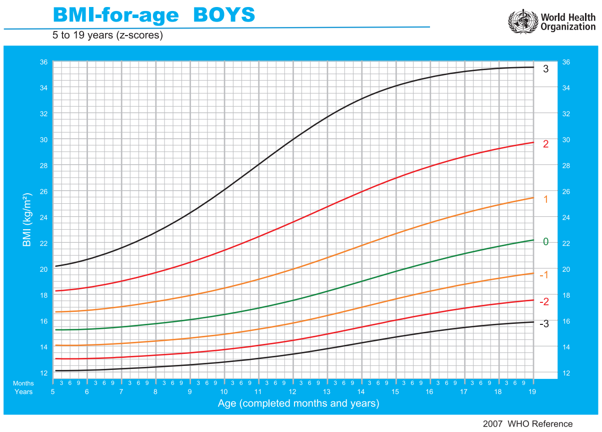

[৫] de Onis et al. 2007

৩.৩ সাপ্তাহিক আয়রন ফলিক এসিড (WIFA) ট্যাবলেট সরবরাহ

কৈশোরকালীন সময়ে শারীরিক এবং পেশীর দ্রুত বৃদ্ধির সাথে সাথে আয়রনের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পায়। ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে দ্রুতহারে শারীরিকভাবে বেড়ে ওঠে বলে মেয়েদের চেয়ে তাদের বেশি পরিমাণে আয়রনের প্রয়োজন হয়। আবার মেয়েদের ক্ষেত্রে ঋতুস্রাব আয়রনের চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। কিশোর-কিশোরীদের আয়রন সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা উচিত। আয়রন সমৃদ্ধ খাবারগুলো হলো: লাল শাক-সবজি, মাংস এবং কলিজা। এছাড়াও সবুজ শাক, কলা, শিম, পেঁপে, মসুর, গম এবং গুঁড়ের মধ্যেও আয়রন পাওয়া যায়। তবে খাবারে বৈচিত্র না থাকলে খাবার থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ আয়রন পাওয়া বেশ কঠিন। আয়রন পরিপূরক খাবারগুলো কিশোর-কিশোরীদের রক্তাল্পতা থেকে রক্ষা করে, দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, বুদ্ধির বিকাশ এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। যেহেতু আমাদের দেহে ভিটামিন-এ এর মতো আয়রন প্রচুর পরিমাণে সংরক্ষণ করা যায় না- তাই, নিয়মিত আয়রন গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং তা কিশোরীদের জন্য বেশি প্রয়োজন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন Intermittent Iron and folic acid supplementation in menstruating women 2011 অনুসারে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের কিশোরীদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাব এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাপ্তাহিক আয়রন ফলিক এসিড (WIFA) ট্যাবলেট সরবরাহ কর্মসূচি শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছে। ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার মাত্রা হ্রাস করাই হচ্ছে এই WIFA প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য।

কারা পাবে: সরকারী অথবা সরকারী সহায়তা প্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাব এবং কৈশোর-বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে যোগদান করা ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোরীরা।

কার্যক্রম: প্রতি সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট দিনে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাবে। সাধারণত বৃহস্পতিবার সকালের প্রতিটি শ্রেণিতে সকল ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোরীকে একটি করে আয়রন-ফলিক এসিড ট্যাবলেট (৬০ মি.গ্রা ইলিমেন্টাল আয়রন এবং ৪০০ মাইক্রোগ্রাম ফলিক এসিড) খাওয়ানো হবে।

বি:দ্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন ২০১১ অনুসারে, ১০-১৯ বছর বয়সী মেয়েদের আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট (৬০ মিলিগ্রাম আয়রন এবং ২.৮ মিলিগ্রাম ফলিক এসিড) গ্রহণ করা উচিত এবং তা বিদ্যালয়ে সারাবছর জুড়ে সরবরাহ করা যেতে পারে। বর্তমানে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত আয়রন ফলিক ট্যাবলেটে ফলিক এসিডের পরিমাণ WHO সুপারিশকৃত পরিমাণের চেয়ে কম আছে। তাই, বর্তমানে সহজলভ্য আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট (৬০ মিলিগ্রাম এলিমেনটাল আয়রন এবং ৪০০মিলিগ্রাম ফলিক এসিড) ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের সরবরাহ করা হবে এবং পরবর্তীতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় (WHO)-এর প্রস্তাবিত নির্দেশনা অনুযায়ী বর্তমান কার্যক্রম প্রতিস্থাপিত করবে।

কে দিবেন: প্রতিটি শ্রেণিতে শ্রেণি শিক্ষক গাইড শিক্ষকের সহায়তায় আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট বিতরণ করবেন। ক্লাব লিডার এবং ক্লাব সদস্যরা বিতরণ, রেকর্ড এবং সংগ্রহে সহায়তা করবে।

আয়রন ফলিক এসিড বিতরণের সময় যা খেয়াল রাখতে হবে:

- ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সকালের নাস্তা খেতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, বিশেষভাবে বৃহস্পতিবার। সকালের নাস্তা করে নাই এমন কিশোরীকে আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট দেয়া যাবে না।
- গাইড শিক্ষক প্রতিটি শ্রেণির শ্রেণি শিক্ষক এবং ছাত্রীদেরকে সাপ্তাহিক আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট বিতরণের সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত করবেন।
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শ্রেণি শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত সকল ১০-১৯ বছর বয়সী ছাত্রীদেরকে সপ্তাহে একটি করে আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট খাওয়ানো হবে।
- কোন ছাত্রী নির্দিষ্ট দিনে অনুপস্থিত থাকলে পরবর্তী সপ্তাহের শুরুতেই আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট গ্রহণ করবে।
- মারাত্মক রক্তস্বল্পতায় ভুগছে এমন ছাত্রীকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফার করতে হবে এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে না যাওয়া পর্যন্ত সাপ্তাহিক আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট খাওয়া নিশ্চিত করতে হবে।

- আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট খাওয়ার জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিত করতে হবে।
- বিদ্যালয়ের বার্ষিক ছুটি হওয়ার সময় ছাত্রীদেরকে নির্দিষ্ট সংখ্যক আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট বিতরণ করতে হবে, যা তারা অভিবাবকের তত্ত্বাবধানে খাবে এবং ছুটির শেষে সংগ্রহকৃত আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট-এর খালি স্ট্রিপগুলো রেকর্ড সংগ্রহের জন্য শ্রেণি শিক্ষকের কাছে জমা দিবে।
- পুষ্টি শিক্ষা সেশনের সময় শিক্ষার্থীরা আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট সেবনের উপকারিতা এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত হবে।

- **কালো মল**
- **বমি বমি ভাব**
- **কিছু কিছু ক্ষেত্রে বমি**

তবে প্রতিদিন খেলে এ জাতীয় পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সময়ের সাথে সাথে হ্রাস পায়

পুষ্টি শিক্ষা সেশনে ছাত্রীরা আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেটের সুফল সম্পর্কেও অবগত হবে:

- **বিদ্যালয়ে মনোযোগ এবং বিদ্যালয়ের কর্মদক্ষতা বাড়া**
- **শক্তিশালী অনুভব করা এবং কম ক্লান্ত বোধ করা**
- **প্রতিদিনের কাজে শক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা**
- **রুচি বৃদ্ধি**
- **ভালো ঘুম**
- **উন্নত ত্বকের উপস্থিতি**
- **মাসিক নিয়মিতকরণ**
- **গর্ভ-পূর্ব সুস্বাস্থ্য প্রাপ্তি**
- **কাজ এবং উপার্জনের সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধি**

আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেটের চাহিদা এবং সংরক্ষণ:

- গাইড শিক্ষক আয়রন ফলিক ট্যাবলেটের চাহিদা নিরূপণ করবে এবং সরবরাহের জন্য স্বাস্থ্য-সহকারীর মাধ্যমে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসারের কাছে চাহিদাপত্র জমা দেবে। গাইড শিক্ষক আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেটের সংরক্ষণ ও এগুলোর রেকর্ড রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন।
- আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেটের বাৎসরিক সরবরাহ পরিষ্কার, শুকনা ও ধুলোবালিবিহীন জায়গায় রাখতে হবে।

আয়রন ফলিক এসিডের চাহিদা নির্ণয়:

আয়রন-ফলিক ট্যাবলেটের আনুমানিক হিসাব

বছরের জন্য আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট = ৫২ x ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি/বছর মোট শিক্ষার্থী (কেবলমাত্র মেয়েরা) এবং বাফার হিসাবে অতিরিক্ত ২০% মজুদ যুক্ত করা হবে

- আয়রন ফলিক ট্যাবলেটের জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নীচের ফরমটি পূরণ করে স্বাস্থ্য সহকারীর মাধ্যমে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসারের কাছে জমা দেবেন।
- উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার সিভিল সার্জন অফিসের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এই কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় আয়রন ফলিক এসিড সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন।

আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেটের চাহিদাপত্র
তারিখ:
বিদ্যালয়ের নাম:
বিদ্যালয়ের ঠিকানা:
মোট ছাত্রী সংখ্যা:
বাৎসরিক (২০২০) আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেটের চাহিদা:
আগামী তিন মাসের জন্য মোট আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেটের চাহিদা:
আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট বিতরণের সময়: (মাস-মাস) বছরঃ
স্বাক্ষর (গাইড শিক্ষক-১) **স্বাক্ষর (গাইড শিক্ষক-২)** **স্বাক্ষরঃ প্রধান শিক্ষক**

পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন

- শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে সুস্বাস্থ্য কার্ডটি পূরণ করছে কিনা সে ব্যাপারে শ্রেণি শিক্ষক এবং গাইড শিক্ষক দায়িত্বরত থাকবেন।
- আয়রন ফলিক ট্যাবলেট গ্রহণের তথ্য প্রতি সপ্তাহে শ্রেণি শিক্ষক সংশিষ্ট বিদ্যালয়ের ক্লাব লিডার এবং ক্লাব সদস্যদের মাধ্যমে (৬ষ্ঠ থেকে ১২তম শ্রেণি) শ্রেণি রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করবেন।
- মাসের শেষে শ্রেণি শিক্ষক প্রতি মাসে ৪/৫ টি আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট-সেবনকারী মেয়েদের সংখ্যার (এক মাসে পাঁচ সপ্তাহের ক্ষেত্রে পাঁচটি ট্যাবলেট) তথ্য সংকলন করবেন।
- যে মেয়েরা একমাসে ন্যূনতম চারটি আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট সেবন করতে পারবে না, তাদের ক্ষেত্রে সেবন না করতে পারার কারণ শ্রেণি রেজিস্ট্রারে উল্লেখ করতে হবে ।
- শ্রেণি শিক্ষক এবং গাইড শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে প্রতি মাসের জন্য মাসিক তথ্য সংকলন করবেন।
- গাইড শিক্ষকরা মাসিক শ্রেণিভিত্তিক রেজিস্ট্রার থেকে সমস্ত তথ্য একত্রিত করে মাসিক রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে জমা দিবেন।
- প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের মাসিক রেজিস্ট্রারের তথ্য পর্যালোচনা করবেন, স্বাক্ষর করবেন এবং ডিএইচআইএস-২ এর সাথে ই-রিপোর্টিং সিস্টেম সংযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ম্যানুয়াল ফরম্যাটে উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা অফিসগুলিতে জমা দিবেন।
- প্রধান শিক্ষক এই মাসিক বিদ্যালয় প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি পুষ্টি-বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটিতেও (এসিএন) প্রেরণ করবেন।
- সব মেয়ে শিক্ষার্থীরা একটি সুস্বাস্থ্য কার্ড সাপ্তাহিক আয়রন ফলিক ট্যাবলেট প্রাপ্তির রেকর্ডের জন্য ব্যবহার করবে।

৩.৪ কৃমি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলের পাশাপাশি শহরাঞ্চলে, বিশেষ করে বস্তিসমূহে, ব্যক্তিগত অপরিচ্ছন্নতা এবং অপরিষ্কার পরিবেশের কারণে কৃমিরোগ বিস্তার লাভ করছে। যার ফলে কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার উপর তা মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। অন্ত্রের কৃমি মূলত একধরণের পরজীবী যা মানুষের অন্ত্রের মধ্যে থাকে এবং আমাদের দৈহিক বৃদ্ধি এবং সুস্থ থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলোকে শোষণ করে। বেশ কয়েক ধরণের কৃমি রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ: ফিতা কৃমি, বক্র কৃমি এবং সুতা কৃমি। তবে বাংলাদেশে বিদ্যালয়-পড়ুয়া শিশুদের মধ্যে গোল কৃমি ও বক্র কৃমির সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ কার্যক্রম একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, যা মানুষের শরীরে কৃমি সংক্রমণে বাধা দিয়ে কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক বৃদ্ধি ও বুদ্ধি বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ছয়-মাস অন্তর অন্তর অর্থাৎ বছরে মাত্র ২ বার নিজে এবং পরিবারের সকলে একসাথে কৃমিনাশক ঔষধ মেবেনডাজল (৫০০ মিলিগ্রাম) সেবনের মাধ্যমে কৃমিরোগ অনেকাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

২০১৭ সাল থেকে স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তরের অধীনে সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা (সিডিসি), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বছরে ২ বার জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ পালন করে আসছে। এই প্রোগ্রাম অনুসারে, মেবেনডাজল (৫০০ মিলিগ্রাম) ট্যাবলেটের প্রথম ডোজ এপ্রিল মাসে এবং দ্বিতীয় ডোজ ছয় মাস পরে অর্থাৎ অক্টোবর মাসে নির্ধারিত হয়েছে।

প্রতি বছর সপ্তাহ শুরুর আগে সিডিসি সাধারণত সমস্ত শিক্ষা অফিসার, স্বাস্থ্যসেবাদানকারী, পরিবার পরিকল্পনা কর্মী এবং শিক্ষককে জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ বাস্তবায়নের বিষয়ে সকল ধরনের দিকনির্দেশনা সরবরাহ করে থাকে।

৩.৫ বিদ্যালয় ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে রেফারাল পদ্ধতি স্থাপন

মারাত্মক রক্তস্বল্পতা, মারাত্মক অপুষ্টি, মানসিক এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ইত্যাদির মত কৈশোরকালীন সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য সুবিধার পাশাপাশি, উপযুক্ত এবং নিকটস্থ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে (যেমন: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স অথবা কমিউনিটি ক্লিনিকে) শিক্ষার্থীদের প্রেরণের জন্য রেফারাল পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১০-১৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের অপুষ্টি সমস্যা সমাধানের জন্য তাদেরকে বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী কৈশোর-বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য রেফার করা উচিত।

উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে প্রেরণ করা দরকার এমন অসুস্থ শিক্ষার্থীদের সনাক্ত করার জন্য প্রধান শিক্ষক, গাইড শিক্ষক, ক্লাব লিডার এবং স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যদের পর্যাপ্ত জ্ঞান এবং দক্ষতা থাকতে হবে।

- শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমে অপুষ্টি এবং রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত শিক্ষার্থীদের সনাক্ত করে পরবর্তী পরামর্শের জন্য নিকটতম এবং উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে পাঠাতে হবে। (বি:দ্র: অপুষ্টি ও রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত শিক্ষার্থীদের সনাক্তকরণে উচ্চ প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং দক্ষতার প্রয়োজন নেই। বরং সাধারণ শারীরিক পর্যবেক্ষণই যথেষ্ট)।

- আয়রন ফলিক ট্যাবলেট গ্রহণের সময় (গাইডলাইন অনুসারে শুধুমাত্র খাওয়ার পরে সেবনের পরামর্শ দেওয়া হয়)। কোনও ক্ষেত্রে যদি কোনও মেয়ে শিক্ষার্থী পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার শিকার হয়, শিক্ষক তাকে কাছের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে রেফার করবেন।

- বিবাহিত কিশোরীদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রথম গর্ভধারণ বিলম্বের জন্য পরামর্শ প্রদান করতে হবে এবং পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে রেফার করতে হবে।

- যদিও কৈশোরে মেয়েদের গর্ভধারণ কখনোই কাম্য নয়, তবুও গর্ভবতী কিশোরীদের নিকটস্থ কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে অবশ্যই গর্ভকালীন সেবার জন্য (ANC) পাঠাতে হবে।
- যে কোন শিক্ষার্থীর কোন ধরণের অসুস্থতা ধরা পড়লে যদি চিকিৎসার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে তাদেরকে উপযুক্ত চিকিৎসা এবং পরামর্শের জন্য নিকটতম, যথাযথ স্বাস্থ্যসুবিধা সম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে রেফার করতে হবে।

<table>
<tr><th colspan="7">হাসপাতালের রেফারেল কার্ড</th></tr>
<tr><th>শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য</th><th colspan="6">শুধুমাত্র হাসপাতালের ব্যবহারের জন্য</th></tr>
<tr><td rowspan="9">তারিখ: ..../................../................
বিদ্যালয়ের নাম: ....
উপজেলা: .... জেলা: ....
শিক্ষার্থীর নাম: .... শ্রেণি: ....
অভিভাবকের নাম: ....
রেফার করার কারণ: ....
....
কোথায় রেফার হয়েছে: ....
কে রেফার করেছে: ....

সিল এবং স্বাক্ষর</td><td colspan="3">লিঙ্গ</td><td>বয়স</td><td>ওজন</td><td>উচ্চতা</td></tr>
<tr><td colspan="3">☐ ছেলে ☐ মেয়ে ☐ অন্যান্য</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>বৈবাহিক অবস্থা</td><td colspan="2">অসুস্থতার বর্ণনা</td><td colspan="3">রক্তস্বল্পতা (শারীরিক পরীক্ষার ভিত্তিতে)</td></tr>
<tr><td>☐ অবিবাহিত
☐ বিবাহিত
☐ অন্যান্য</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">☐ (-)
☐ (+)
☐ (++)
☐ (+++)</td></tr>
<tr><td colspan="2">ফলো-আপের প্রয়োজনীয়তা</td><td colspan="4">প্রেসক্রিপশন প্রদান করা হয়েছে কিনা</td></tr>
<tr><td colspan="2">☐ হ্যাঁ, কতদিন পর-
☐ না</td><td colspan="4">☐ হ্যাঁ (সংযুক্ত করুন) -
☐ না</td></tr>
<tr><td colspan="6">স্বাক্ষর ও তারিখ:</td></tr>
</table>

৩.৬ শরীরচর্চা কার্যক্রম প্রচার

বিদ্যালয়ে শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে রয়েছে শারীরিক শিক্ষা, বিনোদন, নৃত্যানুষ্ঠান, বিদ্যালয় অ্যাথলেটিকস এবং ছুটির সময় সক্রিয় খেলাধুলা; বিদ্যালয়ে যাওয়া আসার পথে হাঁটা বা সাইকেল চালানো; এবং নিয়মিত পাঠক্রম বহির্ভূত কাজ করা যা অবসর সময়ে শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সুযোগ করে দেয়।

কৈশোরকালীন শারীরিক কার্যক্রম যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাড়ন্ত বয়সে মাংসপেশি এবং হাড়গঠনে, কার্ডিওভাস্কুলার-নিউরোমাসকুলার তন্ত্র গঠনে, সর্বোপরি সুস্থ-সবল দেহ গঠনে এবং সুন্দর মন গড়তে শরীরচর্চার বিকল্প নেই। এছাড়া নিয়মিত শরীরচর্চা স্থুলতা এবং অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। দৈনিক ৬০ মিনিট অথবা তার অধিকক্ষণ সময় ধরে শরীরচর্চা আমাদের শরীরকে সতেজ এবং সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

প্রতিদিনের দৈহিক ক্রিয়াকলাপের বেশিরভাগ অংশটি অ্যারোবিক হওয়া উচিত। প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে তিনবার পেশী এবং হাড়কে শক্তিশালী করে এমন শরীরচর্চামূলক ক্রিয়াকলাপগুলি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

কোন ধরণের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ একজন ব্যক্তির করা উচিত?

- **প্রতিদিন ৬০ মিনিট- হাঁটা, দৌড়ানো, সাইকেল চালানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাজনিত ঘরের কাজ, ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল, বল-নিক্ষেপ ইত্যাদি।**
- **সপ্তাহে ২/৩ দিন পেশী তৈরির অনুশীলন যেমন- সাঁতার কাটা, নৌকা চালানো, দড়ি টানাটানি এবং বিভিন্ন ধরণের শারীরিক ব্যায়াম।**

- বিদ্যালয়ের শরীরচর্চা শিক্ষক বা তার অনুপস্থিতিতে প্রধান শিক্ষক একজন শিক্ষককে নিয়মিত শারীরিক অনুশীলন, খেলার জন্য নিযুক্ত করবেন।
- শরীরচর্চা শিক্ষক কখন এবং কীভাবে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা এবং শারীরিক অনুশীলন করাবেন তার একটি পরিকল্পনা/ক্যালেন্ডার তৈরি করবেন।
- বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে বিদ্যালয় সময়ের মধ্যে বাস্কেটবল, টেবিল টেনিস, দড়ি লাফ, দাবা, ক্যারাম ইত্যাদির মতো ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা থাকতে পারে।
- শরীরচর্চা শিক্ষক এবং ক্লাব লিডার শারীরিক অনুশীলন যেমন- শরীর ও পেশী তৈরির অনুশীলন ইত্যাদির বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেবেন।
- শ্রেণি শিক্ষক ইনডোর এবং আউটডোর গেমসের জন্য দুইজন ক্যাপ্টেন নির্বাচন করবেন।
- বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের সাইকেল চালাতে এবং ট্র্যাফিক নিয়ম সম্পর্কে সচেতন হতে উৎসাহিত করবেন।

অধ্যায় ৪

বিদ্যালয়ভিত্তিক কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সাথে কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাবের যোগাযোগ স্থাপন

৪ বিদ্যালয়ভিত্তিক কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সাথে কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাবের যোগাযোগ স্থাপন

বিদ্যালয়ভিত্তিক এই কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রমটি উল্লেখযোগ্য-সংখ্যক কিশোর-কিশোরীদের কাছে পৌঁছালেও, এখনো ৫০% এরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ের আওতার বাইরে রয়ে গেছে, যার একমাত্র কারণ: মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি থেকে উচ্চহারে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া। বর্তমানে বাংলাদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার মাত্র ৪৬.১%।

বিদ্যালয়ভিত্তিক এই কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রমটি বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, অনুশীলন, আচরণ, শিক্ষণ সমৃদ্ধ করার জন্য একটি অনন্য সুযোগ তৈরি করেছে। বিদ্যালয়গামী কিশোর-কিশোরীরা বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান সমৃদ্ধ করতে এবং উপযুক্ত পুষ্টির আচরণকে প্রভাবিত করতে "পরিবর্তনের এজেন্ট" হিসেবে কাজ করবে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MOWCA) কমিউনিটি পর্যায়ে প্রায় ৫,০০০ কিশোর-কিশোরী ক্লাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিল। বিদ্যালয়ের কিশোর-কিশোরী ক্লাবগুলির ক্লাব লিডার এবং সদস্যরা এই উদ্যোগের মূল অংশ। বিদ্যালয়ভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম থেকে শিক্ষার মাধ্যমে ক্লাব লিডার এবং ক্লাব সদস্যরা তাদের কমিউনিটি পরিবর্তনের রোল মডেল এবং এজেন্ট হিসেবে কাজ করবে এবং কমিউনিটি কিশোর-কিশোর ক্লাবগুলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা কিশোর-কিশোরীদের সাথে জ্ঞান ভাগাভাগি করে নিতে পারবে।

কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাবগুলিও এই নির্দেশিকা অনুসারে পুষ্টি কার্যক্রমের প্যাকেজটি বাস্তবায়ন করবে। ফ্যাসিলিটেটর এবং ক্লাব লিডাররা, MOWCA এবং DGHS-এর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাবগুলিতে পুষ্টি কার্যক্রম প্যাকেজ বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

সংযুক্তি-১: অপারেশনাল গাইডলাইন তৈরির কৌশল

Nutrition Implementation Core Committee (NICC)-এর সুপারিশের উপর ভিত্তি করে এই "কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে গাইডলাইন"-টি তৈরি করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের (ডিজিএইচএস) অধীনস্থ জাতীয় পুষ্টিসেবা/ জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (আইপিএইচএন) এর যৌথ উদ্যোগে সকল বিভাগের ২০টি জেলা থেকে ৪০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পুষ্টিশিক্ষা বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ২০১৮ সালের মাঝামাঝি থেকে ২০১৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে এটি পরামর্শমূলক প্রক্রিয়া শুরু করে। পরবর্তীতে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের Nutrition Implementation Core Committee (NICC) গাইডলাইনটির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। "কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে গাইডলাইন"-এ বিভিন্ন অংশীদারদের মতামত যেন সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় তা নিশ্চিত করতে মে ২০১৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যাপক পরামর্শ প্রক্রিয়া হাতে নেওয়া হয়েছিল। এই পরামর্শগুলিতে জাতীয়, আঞ্চলিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, একাডেমিয়া, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংস্থা এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার অংশগ্রহণকারীদেরকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। এতে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়ে গ্রুপ আলোচনা সভা করা হয়। বিভিন্ন কর্মশালার আউটপুট এবং সুপারিশ সংকলন করে তা নথিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল।

২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে তৃতীয় বৈধতা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা ক্ষেত্রগুলোর মূল ব্যক্তি এবং পরিসেবা সরবরাহকারীদের সাথে বেশ কয়েকটি গ্রুপ আলোচনা এবং একক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

MOH&FW এবং MOE-এর অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়ার আগে কমিটি গাইডলাইনটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা এবং চূড়ান্তকরণের জন্য জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (আইপিএইচএন) সাত সদস্যের সমন্বয়ে একটি ছোট পরিসরে টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করেছিল। টেকনিক্যাল কার্যনির্বাহী গ্রুপটি সমস্যা রয়েছে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো চিহ্নিত করা এবং তা সমাধান করা, এবং সংশ্লিষ্ট সবগুলো খাতের সাথে সমন্বয় কার্যকর করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। Nutrition Implementation Core Committee (NICC) গাইডলাইনটির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের অনুমোদন দেয়। পরবর্তীতে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের NNS Steering committee গাইডলাইনটি বাস্তবায়নের অনুমোদন প্রদান করে।

নীচের টেবিলটি গাইডলাইন তৈরির উলেখযোগ্য ঘটনাবলীর তালিকা প্রদান করে:

টেবিল: অপারেশন গাইডলাইন উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাইলফলক

সময়	ঘটনা
১১ এপ্রিল, ২০১৯	"কৈশোরকালীন পুষ্টি র্কাযক্রম বাস্তবায়নে গাইডলাইন" তৈরী করার জন্য এনআইসসিরি সভার সুপারিশ
২০ মে, ২০১৯	অপারেশনাল গাইডলাইন তৈরির জন্য সমান্তরালভাবে দুটি স্টেকহোল্ডারদের কর্মশালা
জুন থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত	অপারেশনাল গাইডলাইনের খসড়া তৈরি এবং পর্যালোচনা
সেপ্টেম্বর ২৩, ২০১৯	স্টেকহোল্ডারদের কর্মশালার মাধ্যমে অপারেশনাল গাইডলাইনটির পর্যালোচনা এবং বৈধতাদান
অক্টোবর ২, ২০১৯	পর্যালোচনার জন্য টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ গ্রুপ তৈরি করা এবং দায়িত্ব অর্পণ করা
অক্টোবর ২০১৯	৮টি বিভাগে ইউনিসেফের জোনাল নিউট্রিশন অফিসারদের পরিচালিত গাইডলাইনে বর্ণিত বিভিন্ন পদ, বিভাগ, প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও দায়িত্ব বৈধতার জন্য গ্রুপ আলোচনা এবং ওয়ান-টু-ওয়ান আলোচনা
অক্টোবর ২০১৯	টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ গ্রুপ দ্বারা চূড়ান্ত সংশোধিত অপারেশনাল গাইডলাইন
ডিসেম্বর ১০, ২০১৯	NNS Steering committee-এর অনুমোদন

সংযুক্তি-২: টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ গ্রুপ

সভাপতি:

ডা. এস এম মোস্তাফিজুর রহমান, লাইন ডিরেক্টর, জাতীয় পুষ্টিসেবা (এনএনএস)

সমন্বয়কারী:

ডা. নন্দলাল সূত্রধর, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এনএনএস, আইপিএইচএন

ডা. আইরিন আখতার চৌধুরী, নিউট্রিশন অফিসার, ইউনিসেফ বাংলাদেশ

সদস্য:

প্রফেসর প্রবীর কুমার ভট্টাচার্য্য, পরিচালক, প্রশিক্ষণ, মাউশি

মোহাম্মদ মাজহারুল হক মাসুদ, সহকারী পরিচালক, প্রশিক্ষণ, মাউশি

ডা. এমআই বুলবুল, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এনএনএস

ডা. রোমেন রায়হান, সহযোগী অধ্যাপক, বিএসএমএমইউ

ডা. আমান উলাহ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, স্কুল স্বাস্থ্য, ডিজিএইচএস

ডা. নিজাম আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, এসকেএনএফ

সাইকা সিরাজ, কান্ট্রি ডিরেক্টর, নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল

সংযুক্তি-৩: অপারেশনাল গাইডলাইন: উন্নয়ন কর্মশালায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অবদান (জ্যেষ্ঠতা অনুসারে নয়)

১ **ডা: মো: শাহনেওয়াজ**, মহাপরিচালক
বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (বিএনএনসি)

২ **ডা: সমীর কান্তি সরকার**, পরিচালক
এম আই এস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৩ **ডা: মো: খলিলুর রহমান**, পরিচালক
জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (আইপিএইচএন)

৪ **ডা: মো: ইউনুস**, পরিচালক (মনিটরিং সেল)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৫ **ড. প্রবীর কুমার ভট্টাচার্য্য**, পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

৬ **ডা. এস এম মোস্তাফিজুর রহমান**, লাইন ডিরেক্টর
জাতীয় পুষ্টিসেবা (এনএনএস)

৭ **ডা: পবিত্র কুমার কুণ্ডু**, উপ-পরিচালক, পিএম-৩
জাতীয় পুষ্টি সেবা (এনএনএস)

৮ **ডা: কামরুন নাহার**, উপ-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৯ **ডা: তাহমিনা সুলতানা**, উপ-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

১০ **ডা: এ এফ এম শাহাবুদ্দিন খান**,
সিভিল সার্জন (ভারপ্রাপ্ত), ঢাকা

১১ **ডা: মো: আব্দুল আলিম**, ডিপিএম, আইপিএইচএন

১২ **মুহ: আমান উলাহ**, আলিম, ডিপিএম
এনএনএস, আইপিএইচএন

১৩ **ডা: মুরাদ মোরশেদ**, ডিপিএম, এনএনএস, আইপিএইচএন

১৪ **ডা: এম. ইসলাম বুলবুল**, ডিপিএম, এনএনএস,
আইপিএইচএন

১৫ **ডা: গাজী আহমদ হাসান**, ডিপিএম, আইপিএইচএন

১৬ **ডা: মো: মনিরুজ্জামান**, ডিপিসি, আইপিএইচএন

১৭ **ডা: শহীদুল আলম**, রিপ্রেজেন্টাটিভ, আইইসিটিইএইচ

১৮ **ডা: সাইকা নিজাম**, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ
এবং সায়েন্স

১৯ **ডা: মো: খালেদুজ্জামান**, সহকারী প্রভাষক, বিএসএমএমইউ

২০ **ডা: মো: সিরাজুল ইসলাম**, ডিপিএম, এনএনএস,
আইপিএইচএন

২১ **ডা: বিভাস চন্দ্র মনি**, ডিডিসি, এনএনএস, আইপিএইচএন

২২ **ডা: নূর রিফফাত আরা**, ডিপিএম, এমএনসিএইচ
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

২৩ **ডা: মো: জহিরুল ইসলাম**, ডিপিএম-এনবিএইচ,
এনএনএইচপি এবং আইএমসিআই, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

২৪ **ডা: আয়েশা সিদ্দিক**, মেডিকেল অফিসার-ওএসডি
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

২৫ **ডা: মো: মঞ্জুর হোসেন**, সহকারী পরিচালক, এমসিএইচ,
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

২৬ **ডা: সায়েদা বেগম**, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
কর্মকর্তা, চাঁদপুর সদর

২৭ **ডা: মুরাদ মো: শমসের তবরিহ খান**, ডিপিএম, এনএনএস, আইপিএইচএন

২৮ **ইঞ্জিনিয়ার মো: নাজমুল আহসান**, ডিপিএম, এনএনএস, আইপিএইচএন

২৯ **ডা: পলাশ চন্দ্র সূত্রধর**, কো-অর্ডিনেটর, বিএসএমএমইউ

৩০ **ডা: মুস্তফা কামাল**, ডিপিএম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৩১ **ডা: শারমিন সুলতানা**, মেডিকেল অফিসার, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৩২ **ডা: বেলায়েত হোসেন**, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা

৩৩ **ডা: বীরেন্দ ভৌমিক**, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, হবিগঞ্জ

৩৪ **ডা: মো: জাহাঙ্গীর শিপন**, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ফরিদগঞ্জ

৩৫ **ডা: কাজী শামীম হোসেন**, ডিডিও, পিএম-১, এনএনএস, আইপিএইচএন

৩৬ **ডা: ফাতেমা আখতার**, ডিপিএম, এনএনএস, আইপিএইচএন

সংযুক্তি-৪: অপারেশনাল গাইডলাইন: উন্নয়ন কর্মশালায় দলগত আলোচনার মাধ্যমে অবদান (জেষ্ঠতা অনুসারে নয়)

১. **ডা: শাহজাহান কবির চৌধুরী**, সিভিল সার্জন, মৌলভীবাজার

২. **ডা: গৌতম রায়**, সিভিল সার্জন, জামালপুর

৩. **ডা: জি. কে. মো: শামসুজ্জামান**, সিভিল সার্জন, বাগেরহাট

৪. **ডা: শেখ আবু শাহিন**, সিভিল সার্জন, সাতক্ষীরা

৫. **ডা: এ. এস. এম. আব্দুর রাজ্জাক**, সিভিল সার্জন, খুলনা

৬. **ডা: পুলক দেবনাথ**, ডেপুটি সিভিল সার্জন, বাগেরহাট

৭. **শাহনাজ বেগম**, নিউট্রিশন অফিসার, ইউনসিফে বাংলাদেশ, খুলনা ফিল্ড অফিস

৮. **ডা: মনোয়ার হোসেইন**, সিভিল সার্জন, বরিশাল

৯. **রমা সাহা**, নিউট্রিশন অফিসার, ইউনসিফে বাংলাদেশ, বরিশাল ফিল্ড অফিস

১০. **মো: মইনুল হক**, সহকারী পরিচালক শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা শিক্ষা অফিস, মৌলভীবাজার

১১. **মনিরা মুস্তারিন ইভা**, সহকারী পরিচালক শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা শিক্ষা অফিস, জামালপুর

১২. **ডা: মো: আলমগীর**, নিউট্রিশন অফিসার, ইউনিসেফ বাংলাদেশ, ময়মনসিংহ ফিল্ড অফিস

১৩. **ডা: সৈয়দ আবু আহম্মাদ শাফি**, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, দেওয়ানগঞ্জ

১৪. **ডা: অসীম কুমার সমাদ্দার**, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাগেরহাট

১৫. **ডা: মো: সাখাওয়াত হোসেইন**, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

১৬. **মুহাম্মাদ ইউনুস**, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, রানাগর

১৭. **দিলিপ কুমার বর্ধন**, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, শ্রীমঙ্গল

১৮. **নিম্মি হোসেন**, নিউট্রিশন অফিসার, ইউনিসেফ বাংলাদেশ, সিলেট ফিল্ড অফিস

১৯. **ডা: আজিজুর রহমান সিদ্দিকী** সিভিল সার্জন, চট্টগ্রাম

২০. **ডা: মো: নিয়াতুজ্জামান**, সিভিল সার্জন, ফেনী

২১. **ডা: শহীদ তালুকদার** সিভিল সার্জন, রাঙ্গামাটি

২২. **ডা: মো: আব্দুল গফ্ফার**, সিভিল সার্জন, লক্ষ্মীপুর

২৩. **ডা: মো: সাখাওয়াত উল্লাহ**, সিভিল সার্জন, চাঁদপুর

২৪. **ডা: সাজেদা বেগম**, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, চাঁদপুর

২৫. **মো: আমিনুল ইসলাম**, উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ফেনী

২৬. **ডা: উবাসুই চৌধুরী**, নিউট্রিশন অফিসার, ইউনিসেফ বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম ফিল্ড অফিস

২৭. **শেখ মো: শহিদুল হাসান**, নিউট্রিশন অফিসার, ইউনিসেফ বাংলাদেশ, রংপুর ফিল্ড অফিস

২৮. **সরিৎ কুমার চাকমা**, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা শিক্ষা অফিস, লক্ষ্মীপুর

সহযোগিতায়

ইউনিসেফ বাংলাদেশ

unicef
for every child

ইউনিসেফ বাংলাদেশ
বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স
১, মিন্টু রোড, রমনা, ঢাকা ১০০০
বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮০২ ৫৫ ৬৬ ৮০৮৮
E-mail: infobangladesh@unicef.org
www.unicef.org.bd